# চাঁদমামা

ডিসেম্বর ১৯৭৩

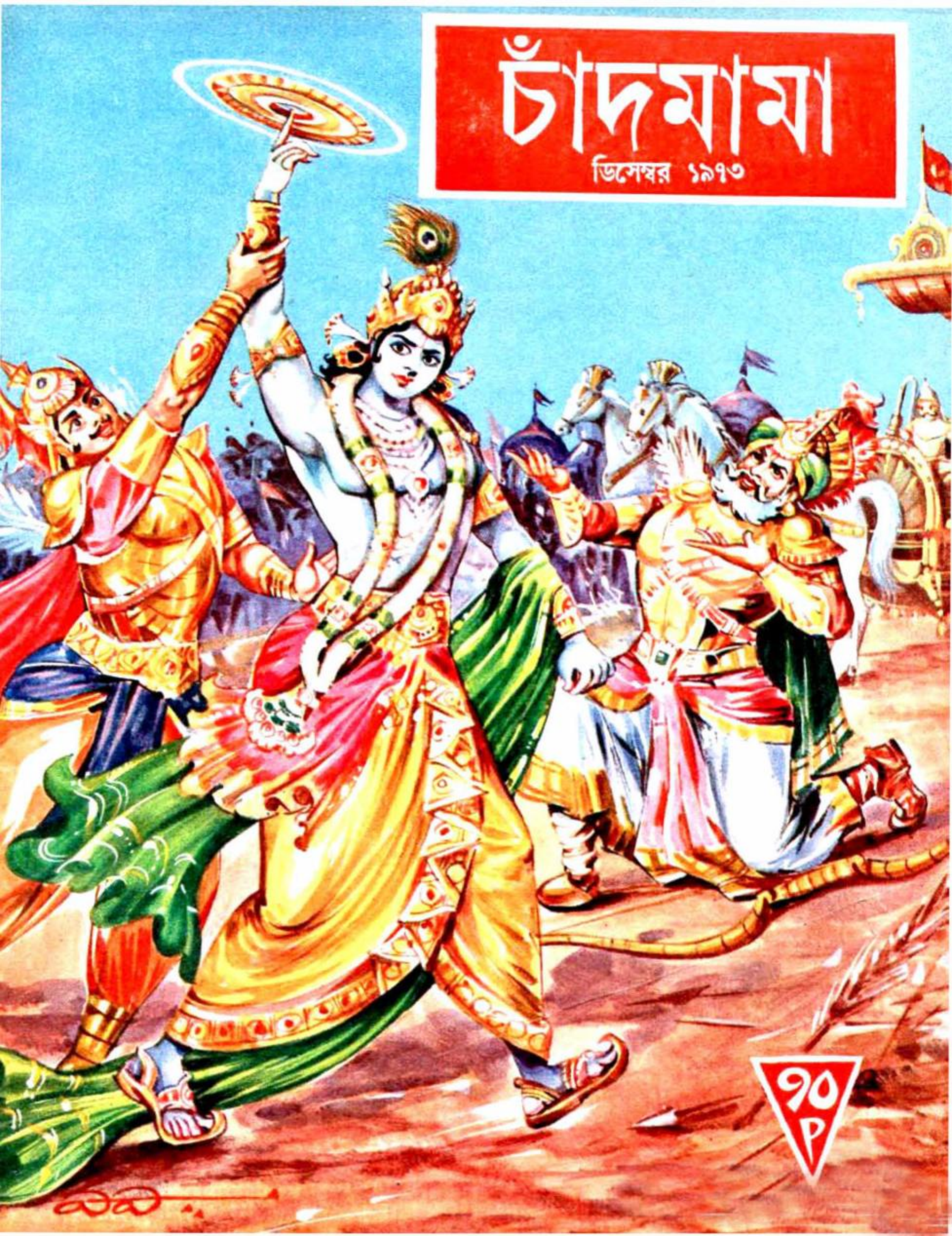

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

## একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

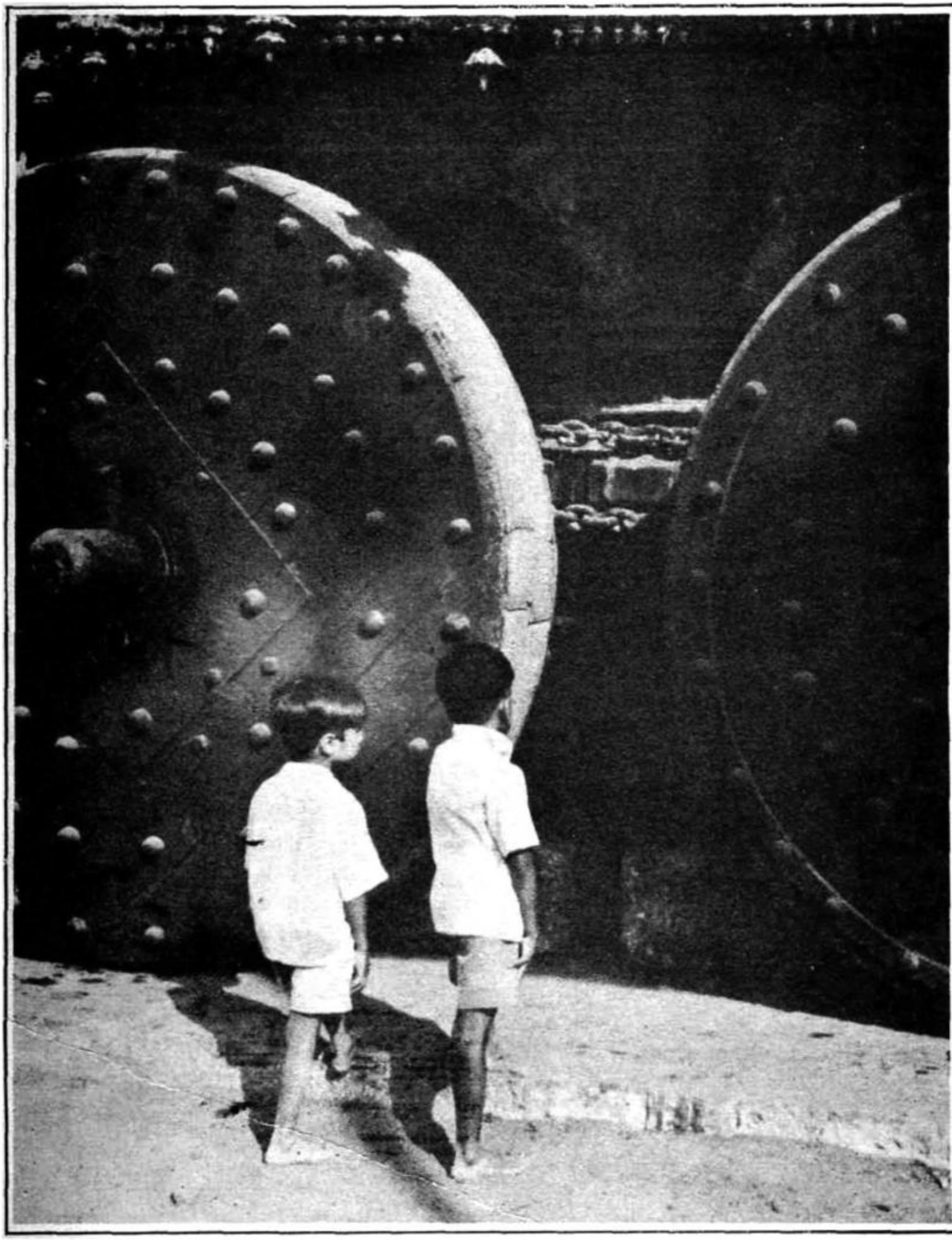

*Photo by:* **K. S. PALANI**

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

# ডোনাল্ড ডাকের সাথে বড় হতে ভারী মজা !

খুব সহজ ও চমৎকার উপায়ে জমানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে আপনার ছেলেমেয়েকে সাহায্য করুন। চার্টার্ড ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় চলে আসুন ও মাত্র ৫ টাকা দিয়ে আপনার ছেলেমেয়ের জন্য একটা ডিস্‌নে ক্যারেক্টার এ্যাকাউন্ট খুলে দিন। প্রতিটি ডিস্‌নে ক্যারেক্টার এ্যাকাউন্টের সাথে বিনামূল্যে দেওয়া ডোনাল্ড ডাক্ মানি বাক্সে জমাতে শিশুরা বড় মজা পায়।

**দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক**

—সেবা যেখানে হিসাবনিকাশের অঙ্গ

ভারতে ব্রাঞ্চসকল—অমৃতসর, বোম্বাই, কলিকাতা, কালিকট, কোচিন, দিল্লী, কানপুর, মাদ্রাজ, নয়াদিল্লী ও ভাস্কো দা গামা।

SEKAI/CB/B/541

# পালন পোষণ যদি ঠিকমত চান তবে বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান!

## পড়াশোনায় চৌকস....খেলাধুলায় ওস্তাদ

পড়াশোনার বা খেলাধূলার চাপে ছেলে-মেয়েদের যে শক্তির অপচয় হয়, তার পূরণ না হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে না। প্রতিদিন বোর্নভিটা খেলে শক্তির উৎস অফুরান থাকে।

বোর্নভিটায় আছে পুষ্টিকর **কোকো**, দুধ, মল্ট ও চিনি—তাই এটি এত সুস্বাদু :

**শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য—**
**ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!**

OBM-0449-BEN.

দিদি, জেম্‌স্‌ নিয়ে তো অনেক খেলেছি...
এবার খেয়ে নেওয়া যাক !
GEMS
GEMS
জেম্‌স্‌ খাওয়ার আনন্দই আলাদা!
কি মিষ্টি, কি চমৎকার !
রং-বেরং ক্যাডবেরিস্‌ মিল্ক চকলেট জেম্‌স্‌।
ফুর্তি করো, নাচো-গাও আর ক্যাডবেরিস জেমস্‌ খাও!
AIYARS-C. 285 BN

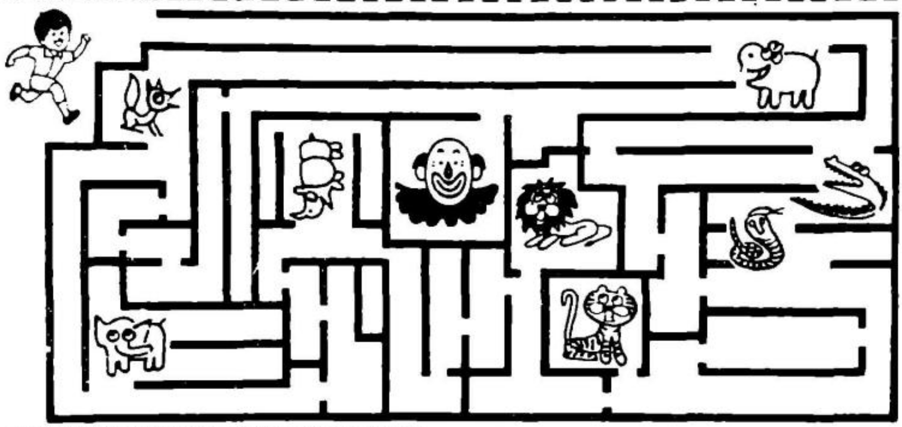

কি করতে হবে জানো: সবচেয়ে কম দূরত্বের রাস্তা ধরে চিকলেট্‌স জোকারের কাছে পৌঁছুতে হবে। খুব সোজা। এখুনি শুরু করো। যে রাস্তায় যাবে ছবিতে সে রাস্তা চিহ্নিত ক'রে দাও।

জোকারের কাছে পৌঁছনর পর নীচের বাক্যটি ইংরেজিতে পূরণ করো। তবে ১০টির বেশী শব্দ ব্যবহার করবে না। তারপর "Chiclets Contest" লিখে তোমাদের প্রবেশপত্র এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও: Post Box 9116, Bombay 25

I like Chiclets best because.

.......

Name...

Age........

Address

Dealers' name and address......

শিগগীর করো!
প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েদের আশাতীত উৎসাহ দেখে শেষ তারিখ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

**প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী**

১. ওয়ার্নার-হিন্দুস্থান লিমিটেডের কর্মচারীদের কিম্বা বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিদের ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর সব ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

২. প্রতিযোগীরা যত ইচ্ছে প্রবেশপত্র পাঠাতে পারে। তবে প্রতিটি প্রবেশপত্রের সঙ্গে ১২টি চিকলেট্‌সের ৬টি খালি প্যাক কিম্বা ২টি চিকলেট্‌সের ১০টি খালি প্যাক পাঠাতে হবে।

৩. প্রবেশপত্র ইংরেজিতে লিখে পূরণ করতে হবে।

৪. প্রবেশপত্র অস্পষ্টভাবে লেখা হলে কিম্বা কম দামের ডাক টিকিট অথবা কোন ডাক টিকিট না থাকলে প্রবেশপত্র বাতিল করা হবে।

৫. নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী প্রতিযোগিতার বিচার করবেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হবে।

৬. কোন পত্রব্যবহার গ্রাহ্য হবে না।

**বিজয়ী প্রতিযোগিদের নাম এই পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় ছাপানো হবে।**

**প্রত্যেক প্রতিযোগী বিনাপয়সায় একটি চিক্‌লেট্‌স ফান অ্যালবাম পাবে।**

everest/507/PP Ben

# চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এবারের বেতাল কথা পড়ে বোঝা যাবে দয়ানিধি কি চেয়েছিল। ধন সম্পত্তির উপর মালিকানা করতে, না দরিদ্র মানুষের সেবা করতে? সেকি পেয়েছিল সুখ আর শান্তি? 'হারানো সুযোগ' কি সে ফিরে পেতে চায়?

অতিরিক্ত লোভের ফলে কেমন করে এক রাজা বন্যার কবলে পড়ে মারা গেল তার কাহিনী পাব 'দুর্বুদ্ধি' নামক চীনা লোককথায়। আরও অনেক কাহিনী আছে। যক্ষপর্বত, মহাভারত ও মিত্র-ভেদ চলছে।

খণ্ড ২ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যা ৬

# অমর বাণী

বিপক্ষ মখিলি কৃত্য প্রতিষ্ঠাখলু দুর্লভা ;
অনীত্বা পঙ্কতাম্ ধূলিম্ উদকম্ নাবতিষ্ঠতে। (মাঘ) ॥ ১ ॥

[শত্রুকে নির্মূল না করে নিজেকে শক্তিশালী করা অসম্ভব। ধূলিকে কাদা বানিয়ে দাবিয়ে রাখার ফলেই জল দাঁড়াতে পারে।]

সুখম্ হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারে স্বিব দীপ দর্শনম্ ;
সুখাত্তু যো যতি নরো দরিদ্রতাম্
মৃত শরীরেণ ধৃতস্ স জীবতি। (শূদ্রক) ॥ ২ ॥

[দুঃখ ভোগের পর সুখ ভোগ করলে অন্ধকার থেকে আলোতে আসার আনন্দ পাওয়া যায়। সুখের পরে যদি দুঃখ ভোগ করতে হয় তো সশরীরে বেঁচে থেকেও মৃতের মত লাগে।]

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্ ;
অবিবেকঃ পরমাপদাম্ পদম্ ;
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণম্
গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ। (ভারবি) ॥ ৩ ॥

[কোন কাজ তাড়াহুড়ো করে করা উচিত নয়। সমস্ত বিপত্তির মূল হচ্ছে বিবেক হীনতা। যে গুণবান ভাল মন্দ ভেবে কাজ করে তারই সম্পত্তি লাভ হয়।]

মহাকবিদের উক্তি

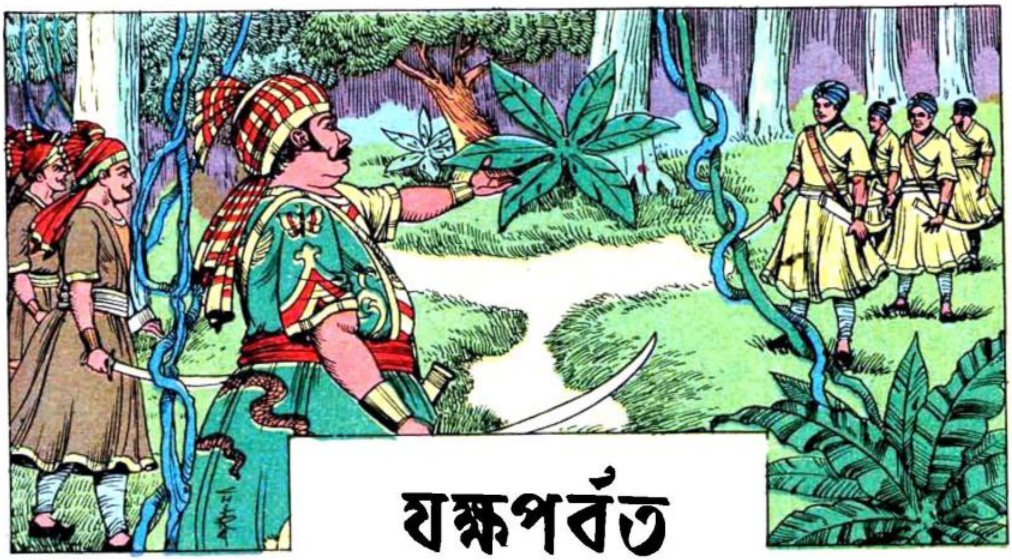

# যক্ষপর্বত

## সতের

[ গুরু-ভালুককে সঙ্গে নিয়ে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত বনের এক পুকুরের কাছে পৌঁছাল। সেখানে ওরা স্বর্ণাচারিকে দেখতে পেল। সমরবাহুর অনুপস্থিতির সময় তার লোকজনের সঙ্গে বীরপুর রাজার সেনাদের একচোট যুদ্ধ হয়েছিল। বীরপুরের সেনারাই সমরবাহুর অনুচরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর…]

বীরপুর রাজার প্রধান শিকারীর সঙ্গে আর মাত্র সাতজন সৈনিক রয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন সমরবাহুর অনুচরদের আঘাতে ঘায়েল হয়ে টলতে টলতে সবার পিছনে পড়ে গিয়েছিল। সমরবাহুর অনুচরদের মধ্যে মাত্র চারজন সেখানে ছিল। কিন্তু চারজন হলেও ওরা ঐ সাতজনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করছিল।

প্রধান শিকারী সমরবাহুর লোকজনকে চিৎকার করে বলল, "ওহে তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা ব্যবসায়ী। তবে তোমাদের পাগড়ীর বাঁধনটা কেমন যেন বেখাপ্পা। এইভাবে পাগড়ী কেউ বাঁধে নাকি? জংলীদের মত। তরবারি চালানোর কায়দা কানুনও তোমরা বোধহয় ঠিক জান না।"

সমরবাহুর অনুচরদের ভীষণ রাগ হল। ওরাও গর্জে বলল, "আমাদের তরবারির আঘাতের মজা ইতিমধ্যে তোমাদের তিন-জন সৈনিক পেয়েছে। ওরা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরাও তরবারির আঘাত পাবে। এবার সাবধান হও। জয় সমরবাহুর জয়!" ধ্বনি দিতে দিতে ওরা বীরসিংহের সৈনিক-দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু ওদের মধ্যে যুদ্ধ বেশিক্ষণ চলল না। বীরসিংহের সৈনিকদের মধ্যে তিন জন ইতিপূর্বেই সমরবাহুর লোকদের তরবারির আঘাতে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যে আসছিল সে সমরবাহুর লোকজনের রণধ্বনি শুনে মুখ ফিরিয়ে পালানোর চেষ্টা করল। প্রধান শিকারী নিজেই পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। ওদের আত্মসমর্পণের ভঙ্গী দেখে সমরবাহুর লোকেরা খুশী হল।

এই সামান্য পাঁচ সাত জনকে পরাজিত করে সমরবাহুর লোক এত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল যেন ওরা এক বিরাট রাজ্য জয় করে এসেছে। ওরা পরাজিতদের এবং নিজেদের তরবারি উপরের দিকে তুলে উচ্ছ্বসিত আনন্দে চিৎকার করে "মহারাজা সমরবাহুর জয়" ধ্বনি দিতে লাগল।

ওদের এই সোচ্চার ধ্বনিতে ঐ বনের ডালপালা ও পাতা যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে। ধ্বনি যত বাড়ে বীরসিংহের সেনাদের মনে ভয়ও তত বাড়ে।

সমরবাহুর লোকজনের সঙ্গে বীরসিংহের সেনাদের যুদ্ধ দেখার জন্য ঐ বনের কয়েকজন অধিবাসী জড়ো হল। সমরবাহুর লোকের রণধ্বনি শুনে আরও কয়েকজন বনের অধিবাসী জড়ো হল। ওরা অবাক হয়ে দেখল বীরসিংহের সেনাদের পরাজিত হতে। ওরা দেখল কিভাবে বীরসিংহের সেনারা তরবারি মাটিতে ফেলে আত্ম-সমর্পণ করল। নিজেদের রাজার সেনাদের মাটিতে গড়াগড়ি খেতেও ওরা দেখল। এই সব দেখে ওরা বুঝল যে সমরবাহুর

লোক অনেক বেশী ক্ষমতাবান। যুদ্ধ করার কৌশলও ওদের অনেক ভাল।

ওরা রাজা বীরসিংহের সেনাদের চেনে। কিন্তু তাদের যারা হারিয়ে দিল তারা যে কোন রাজার সেনা তা তারা জানে না। ভেবেছিল আরও বড় কোন রাজার সেনা। তা না হলে এতটা ক্ষমতা ওরা পায় কোত্থেকে। ওদের ধারণা বেশি ক্ষমতাবান রাজাদের সেনার ক্ষমতাও বেশি থাকে। ওদের সামনে হাতের তরবারি ফেলে দিয়ে করুণ ভাবে বীরসিংহের সেনাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওদের কেমন যেন লাগল। তারপর বনের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে ঐ নতুন অচেনা ক্ষমতাবান রাজা সম্পর্কে নানা কথা বলাবলি করছিল।

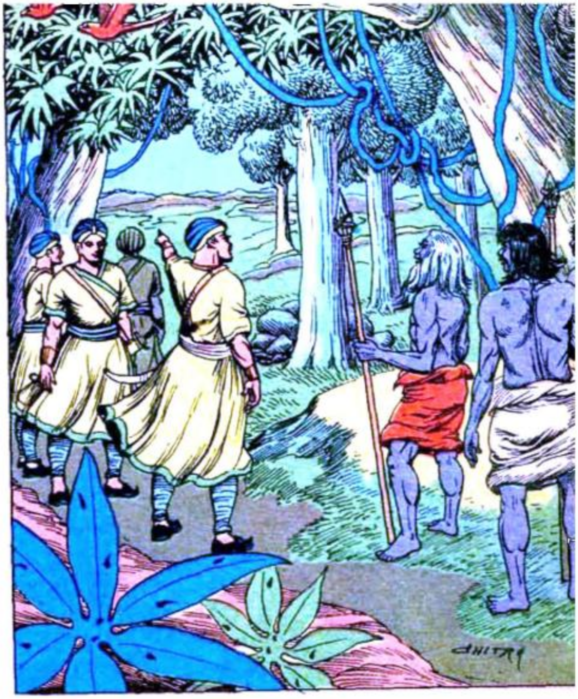

বনের অধিবাসীদের বিস্ময় লক্ষ্য করে সমরবাহুর লোক গুরুগম্ভীর গলায় বলল, "তোমরা এই বনের অধিবাসী? আজ থেকে তোমরা বীরপুরের রাজাকে কাণা-কড়িও কর দেবে না। এই বনের অধিকারী হলেন আমাদের রাজা সমরবাহু। কর যা দিতে হবে রাজা সমরবাহুকে দিও। উনিই তোমাদের রক্ষা করবেন। আমাদের কথা মত না চললে তোমাদের বাঁচার পথ থাকবে না। কঠোর শাস্তি পেতে হবে বুঝেছ?"

বনের অধিবাসীদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে বলল, "আজ্ঞে আপনারা যা বলবেন তাই করবো। তবে আমরা বীরপুরের রাজা বীরসিংহকে দেখেছি। আপনারা রাগ করবেন না। দয়া করে আপনারা আপনাদের পরিচয় দিন। আপ-নারা কোন দেশের রাজার লোক জানান। আপনাদের রাজা কোথাকার রাজা?" ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধটি এক এক করে প্রশ্নগুলো করল।

সমরবাহুর অনুচরদের মধ্যে একজন দূরের এক পাহাড়ের দিকে তর্জনী দেখিয়ে বলল, "দেখ ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও। ঐ যে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাহাড়টা। ঐ পাহাড়ে রয়েছে আমাদের রাজধানী। তোমাদের মধ্যে কারও যদি

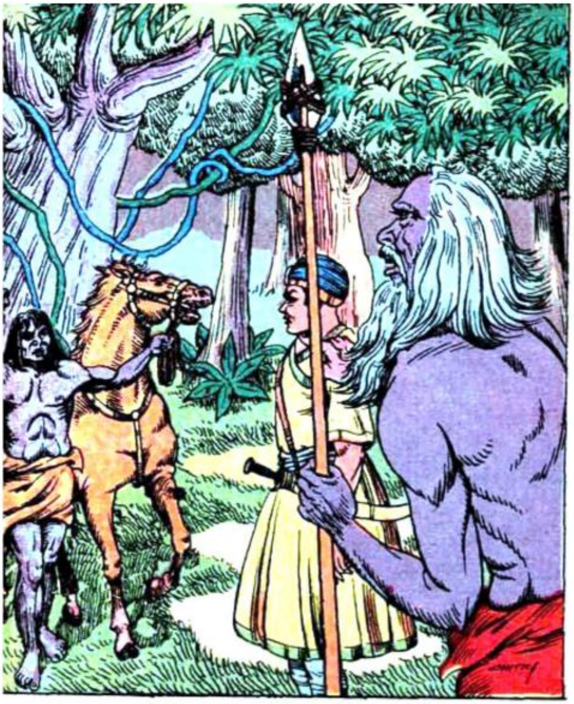

সন্দেহ থাকে সে আমাদের সঙ্গে আসতে পারে। নিজের চোখে দেখে আসতে পারে। পথ ঘাট চিনে রাখা ভাল। সব দেখে সবাইকে জানিয়ে দাও।"

ঐ বুড়ো কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ঘোড়ার ডাক শোনা গেল। সমর-বাহুর লোক চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাল। ওদের মধ্যে একজন বলল, "মনে আছে বীরসিংহের দলের দুজন ছুটে পালিয়েছিল? ওদের ওভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। ওরাই আবার এখন ঘোড়া নিয়ে হয়ত এসেছে। ঘোড়া যখন এনেছে নিশ্চয়ই আরও কয়েকজন লোকও এনেছে। এখন সবাই সাবধান হয়ে যাও। সতর্ক থেকো। কেউ যেন পালাতে না পারে। সমরবাহুর চারজনই অজানা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হল। সুযোগ পেলেই আক্রমণ করবে। তা না হলে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দুটো ঘোড়ার লাগাম ধরে দুজন লোক তাদের কাছে এল। ঐ দুজনকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

সমরবাহুর লোক ভেবে পাচ্ছে না কি বলবে, কি করবে। ততক্ষণে ঐ বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার? তোমরা এই ঘোড়াগুলো কোত্থেকে ধরে আনলে?"

"বীরপুরের রাজা বীরসিংহের সৈনিকরা ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছিল। হঠাৎ ওরা একটা গাছের কাছে থেমে ঐ গাছের সাথে বাঁধা ঘোড়া দুটোর দড়ি কেটে দিল। আমরা আড়াল থেকে এসব লক্ষ্য করেছিলাম। দড়ি কেটে ওরা আবার নিজেদের ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। আমরা কায়দা করে ঘোড়া দুটোকে ধরে এনেছি।" ঘোড়াগুলোকে যারা এনেছিল তারা বলল।

"তোমরা খুব ভাল কাজ করেছ। আমরা আমাদের রাজাকে এই খবর জানাব। তিনি তোমাদের এই বুদ্ধির জন্য অনেক উপহার দেবেন। এই ঘোড়া দুটো নিয়ে চল আমাদের রাজধানীতে। ঐ যে

পাহাড় দেখতে পাচ্ছ ঐ পাহাড়ের বুকেই আমাদের রাজধানী। কি যাবে?" সমর-বাহুর একজন অনুচর বলল।

বনবাসী যুবকরা রাজী হল। সমরবাহুর অনুচর বীরসিংহের দুই পরাজিত সৈনিককে নিয়ে এগিয়ে যাবে এমন সময় ঐ বনবাসী-দের একজন যুবক বলল, "এই যে কর্তারা পিঞ্জরায় বন্দী বাঘ ও সিংহকে নিয়ে যাচ্ছেন না? কয়েকটা পাখিকে জালে বেঁধে গাছে ঝোলানো আছে। ওদের কি ওখানেই রাখা হবে? নিয়ে যাবেন না?"

এই কথা কানে যেতেই সমরবাহুর লোকেরা তৎক্ষণাৎ থেমে বীরসিংহের বন্দী সেনাদের কাছে সিংহ, বাঘ ও পাখি-দের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইল। নানা প্রশ্ন করে সৈনিকদের কাছে জানতে পারল যে প্রধান শিকারীর নেতৃত্বে ঐ পাখিগুলোকে ধরা হয়েছে। কি ভাবে ওরা ঐ পাখিগুলোকে ধরেছে সে বিষয়েও অনেক কিছু জানতে পারল সমরবাহুর অনুচরগণ।

সব কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে সমর-বাহুর লোক চোখ উজ্জ্বল করে বলল, "বাঃ, তোমাদের বুদ্ধির তো তারিফ করতে হয়! এসব পশুপাখিদের এখানে ফেলে রেখে লাভ কি? নিয়ে যাওয়া যাক আমাদের রাজধানীতে। সেখানেই ওরা খেয়ে বাঁচতে পারবে।"

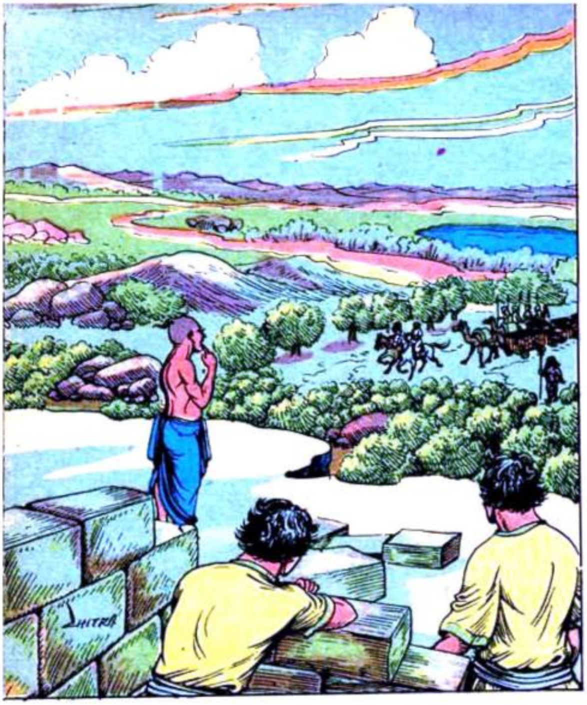

সমরবাহুর অনুচরদের পেছনে পেছনে ঐ বনের বহু অধিবাসী যেতে লাগল। যাওয়ার পথ বাঘ সিংহের গর্জনে ও পাখির ডাকে মুখরিত হয়ে উঠল। সমস্ত অঞ্চলে বিরাট কিছু ঘটে যাওয়ার আবহাওয়া।

সমরবাহুর অনুচররা সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করে বলল, "আমরা কোন দিন হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের ধরিনি, বন্দী করে রাখিনি পিঞ্জরায়। তাই এদের ভাল ভাবে নিয়ে যাওয়ার ভার তোমাদের।"

বনের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকজনের মনে সমরবাহুর লোকদের দেখে আগেই সন্দেহ হয়েছিল। ওরা ভেবেছিল ওরা বিদেশী। কারণ ওরা কোন দিন উট দেখেনি। উটের পিঠে ওদের দেখে এই সন্দেহ ওদের হয়েছিল। হিংস্র পশুদের সম্পর্কে সমরবাহুর লোকদের কথা শুনে একজন বৃদ্ধ বনবাসী এগিয়ে এসে বলল, "হুজুর প্রত্যেকটা পিঞ্জরার নিচে চাকা লাগানো আছে। খুব সাবধানে ঘোড়াদের দিয়ে টানিয়ে নিয়ে গেলে কোন অসুবিধা হবে না। তারপর একটা বাগানের চার দিকে উঁচু দেওয়াল তুলে তার ভিতরে এই বাঘ সিংহ প্রভৃতিকে রাখা যায়।"

"এই সব কাজের ব্যাপারে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের রাজা তোমাদের অনেক কিছু দিয়ে খুশী করবেন।" বলল সমরবাহুর একজন লোক।

বনবাসী সিংহ ও বাঘের পিঞ্জরাকে দড়ি দিয়ে ভাল ভাবে বেঁধে উটের সঙ্গে দড়ির অন্যপ্রান্ত বেঁধে দিল। অন্য উটের পিঠে পাখিদের জাল গুটিয়ে রেখে দিল। তারপর সবাই মিলে ঐ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের উপর থেকে স্বর্ণাচারি হঠাৎ দেখতে পেল, বাঘ, সিংহ, পাখি নিয়ে সমরবাহুর অনুচর এবং বহু বনবাসী ঐ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ওসব দেখে স্বর্ণাচারি বলে উঠল, "আরে একি দেখছি? আমাদের লোক ঘোড়ায় চড়ে আসছে! পিঞ্জরা কোত্থেকে পেল! বনের

অতগুলো লোক এদিকে আসছে কেন? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।"

স্বর্ণাচারির কথা শুনে সমরবাহুর লোকজন, যারা স্বর্ণাচারির কাছে ছিল তারা অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের ঐ ভাবে চোখ ছানাবড়া করে তাকানো দেখে সমরবাহুর যে অনুচররা আসছিল, তাদের একজন বলল, "দেখছ, মহামন্ত্রী স্বর্ণাচারি মশাই ও আমাদের লোকজন কিভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে? আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দি।" বলে ঘোড়া থেকে একজন অনুচর লাফ দিয়ে নেবে লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের উপরে উঠে স্বর্ণাচারির কাছে গেল।

তাকে ছুটতে ছুটতে লাফাতে লাফাতে আসতে দেখে স্বর্ণাচারি এগিয়ে এসে তাকে বলল, "কি ব্যাপার বলতো? তোমরা তো শিকার করতে গিয়েছিলে। এত ঘোড়া, বাঘ এসব কি এনেছ? এত বনবাসী তোমাদের সাথে আসছে কেন?"

সমরবাহুর ঐ লোকটা স্বর্ণাচারির কাছে এসে প্রণাম করে বলল, "মহামন্ত্রী, আমরা শিকার করতে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অত সহজে শিকার করতে পারিনি। বীরপুর রাজার সৈনিকরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা পাল্টা

আক্রমণ করে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছি। ওদের দুজনকে এনেছি। বাকিদের মধ্যে দুজন বীরপুরের দিকে পালিয়েছে। আর অন্যেরা আমাদের তরবারির আঘাতে মারা গেছে।"

বীরপুরের দুজন সৈনিকের পালানোর কথা শুনেই স্বর্ণাচারির চোখে মুখে আশঙ্কা ও আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। এতবড় বিজয়ের খবর শুনেও স্বর্ণাচারির মুখে কোন আনন্দের চিহ্ন ছিল না। তার মনে হল সমরবাহুর লোকেরা ভবিষ্যৎ না ভেবেই মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে।

স্বর্ণাচারি রক্তচক্ষু করে সমরবাহুর ঐ অনুচরকে বলল, "তোমরা ঐ দুজন

সৈনিককে পালাতে দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছ। এর পর প্রস্তুত হও, বিরাট এক বিপদের মোকাবিলা করতে হবে। তাছাড়া তোমরা এসব ঘোড়া আনতে গেলে কেন? আর তার চেয়ে বড় কথা বীরপুর রাজার সেনাদের বিরুদ্ধে ওরকম একটা মারাত্মক কাণ্ড করে বসলে কেন?"

স্বর্ণাচারির কথা শুনে আর তার রক্ত-চক্ষু দেখে বুঝল যে তারা ভুল করেছে। তবুও নিজেরা কোন্ অবস্থায় ঐ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বলল। তাতে কিছু সত্য কিছু মিথ্যাও ছিল।

স্বর্ণাচারি নিজের আগের কথাকে আরও গুরুগম্ভীর গলায় বলল, "যাই হোক না কেন, তোমরা যা করেছ ভুল করেছ। আমাদের নিজেদেরই থাকার ভাল একটা ব্যবস্থা এখনও হয়নি। যে দুজন সৈনিক পালিয়েছে, ওরা বীরপুরের রাজাকে গিয়ে বিস্তারিতভাবে সব বলবে। তারপর রাজা নিজেই সেনা পরিচালনা করে আসবে অথবা অসংখ্য সেনাদের নিয়ে আমাদের এই অঞ্চল আক্রমণ করতে সেনাপতিকে বলবে। তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে সমরবাহু এখন নেই। জীবদত্ত ও খড়্গ-বর্মাও এখানে নেই!"

স্বর্ণাচারির কথা অনুযায়ী একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। স্বর্ণাচরির অনুমান অনুযায়ী ঐ দুজন সেনা বীরপুরে গিয়েছিল। সারা পথে তারা চিৎকার করতে করতে গেল, "দেশ এখন বিপদের মুখে, কোথাকার এক রাজা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে। সবাই সাবধান।"

ওদের কথা নানা ভাবে মুখে মুখে রটতে লাগল, সবাই অজানা এক বিপদের কথা ভাবতে লাগল। নগরবাসী আত্ম-রক্ষার জন্য তরবারি, বল্লম, কুড়ুল প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হল। (আরও আছে)

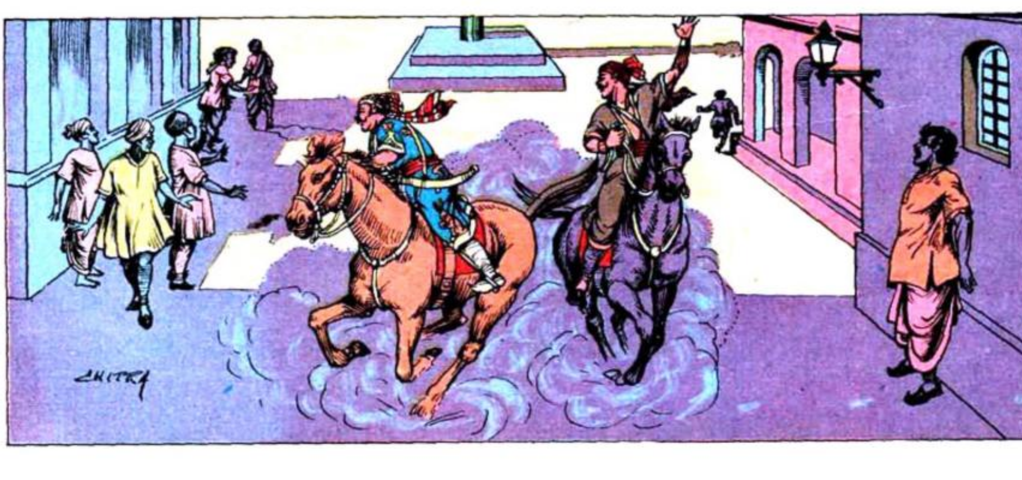

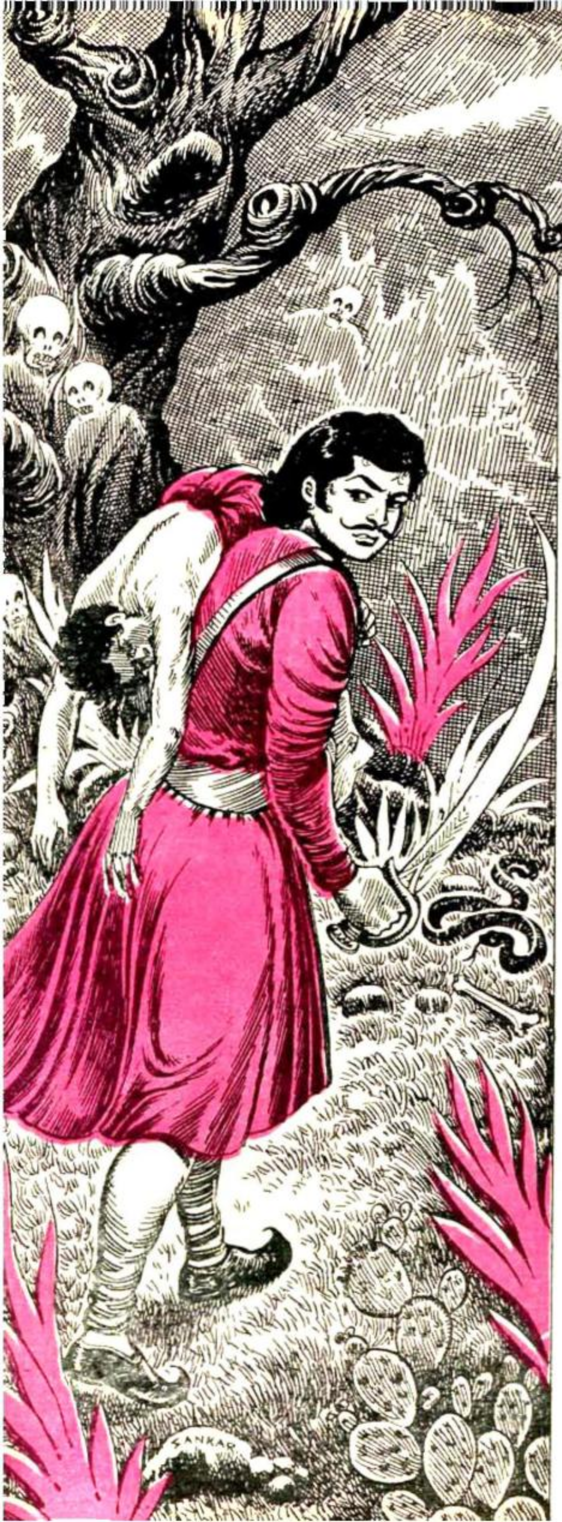

# হারানো সুযোগ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে এলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নামিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "মহারাজ, এই গভীর অন্ধকারে এইভাবে যে কেন পরিশ্রম করছ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি কি জান না যে ঠিক এই সময় এই কাজ করার ফলে তুমি অন্যদিকে বিরাট সুযোগ হারাচ্ছ? ঠিক যে ভাবে দয়ানিধি হারিয়েছিল। দয়ানিধির কাহিনী শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল: দয়ানিধির বাবা ছিল এক বিখ্যাত নৌকা ব্যবসায়ী। সারা জীবন দেশে বিদেশে ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে

## বেতাল কথা

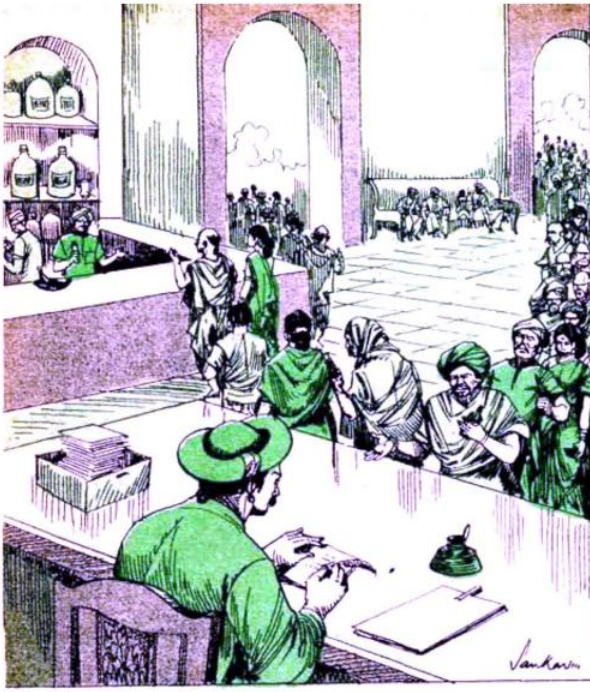

পেরেছিল। দয়ানিধিই ছিল তার একমাত্র পুত্র। তাই তার বাবা ভেবেছিল দয়ানিধিও একদিন মস্ত বড় নৌকা ব্যবসায়ী হবে।

কিন্তু দয়ানিধি যত বড় হতে লাগল তত তার আচার আচরণ অন্য ধরণের হয়ে উঠল। ব্যবসার প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। তার মনে একটা দুশ্চিন্তা ঢুকেছিল, বাবা যে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে তা দিয়ে কি করা যায়। বাচ্চা বয়স থেকেই দয়ানিধির বৈদ্যশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল। মানুষের শরীরে কোথায় কি আছে, কেন অসুখ করে, কোন অসুখে কি ওষুধ দেওয়া যায় প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশোনা করল সে। শেকড়, বাকল এনে নিজেই ওষুধ বানাত। দয়ানিধির এই হাবভাব দেখে তার বাবা তাকে ফেরাতে অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু দয়ানিধির মন ব্যবসায় বসতে চাইল না। চিন্তায় চিন্তায় দয়ানিধির বাবা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। অবশেষে মারা গেল।

বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দয়ানিধি এক বিরাট চিকিৎসালয় তৈরি করল। বিনা পয়সায় ওষুধ বণ্টন করতে লাগল। তার জন্য তার হাজার ভাগের এক ভাগ অর্থও খরচ করে উঠতে পারত না। দয়ানিধি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না তার বাবা তাকে নিয়ে কেন এত দুশ্চিন্তায় পড়েছিল।

বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়ে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন রোগ সারাতে আসত আর ওষুধ নিয়ে যেত। একজনের রোগ সারলে সে দশজনের কাছে প্রচার করত। প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল এবং চিকিৎসালয়ের সুনাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল দেশে বিদেশে।

কিন্তু দয়ানিধির এই ভাবে এত বড় চিকিৎসালয় গঠন বিনা পয়সায় ওষুধ বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে দুধরণের লোক চটে গিয়েছিল। এক হল চিকিৎসক। কারণ তাদের কাছে রোগীরা যেত না। বিনা পয়সায় রোগ সারাতে পারলে চিকিৎসকের

কাছে গিয়ে পয়সা দেবে কেন ? অন্যজন ছিল ধনীরা। ওদের রোগ যখন কোন চিকিৎসকের কাছে সারত না, তখন তাদের যেতে হত দয়ানিধির কাছে। হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়িয়ে দয়ানিধির কাছ থেকে ওষুধ নিতে হত। এতে ধনীরা ভীষণ অপমান বোধ করত। কিন্তু অন্য উপায়ও ছিল না। আর একটা কারণেও ধনীদের কাছে দয়ানিধির আচরণ ভাল লাগল না। তারা ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করে দেশে খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছিল। দয়ানিধির চিকিৎসালয় হওয়ার পর থেকে সারা দেশে দয়ানিধির নামই প্রচারিত হত।

কিভাবে যে তার খ্যাতি নষ্ট করা যায় তা নিয়ে তাদের চিন্তার আর শেষ ছিল না।

কিছু ধনী ভাবতে লাগল অন্য কোন ভাবে উপকার করে নাম করার কথা।

বৈদ্যরাও মাথা ঘামাল। কেউ ভাবল তাকে ইহজগত থেকে সরানোর কথা।

ঠিক এরকম একটা সময়ে সেই দেশের রাজার মৃত্যু হল। রাজার মৃত্যুর পর রাজপুত্র সিংহাসনে বসল। নতুন রাজা যে হল সে গরিব দুঃখীদের দিকে একেবারে নজর দিত না। সে ছিল ভীষণ লোভী। চারদিক থেকে ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বৈদ্যরা ঐ রাজাকে জানাল যে দয়ানিধি ধনী। প্রতি-

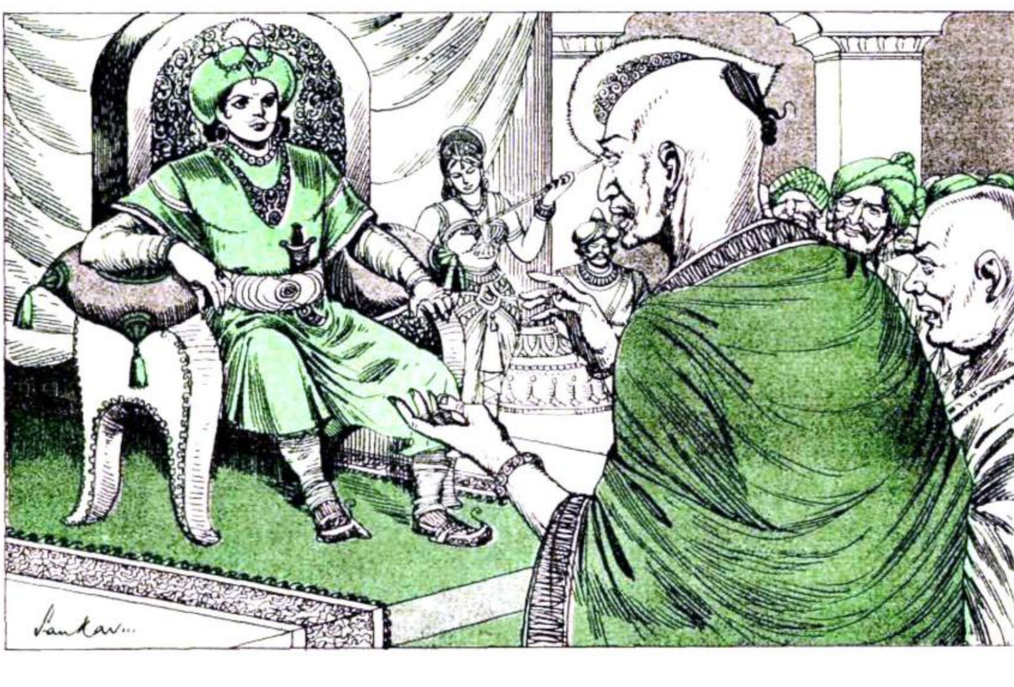

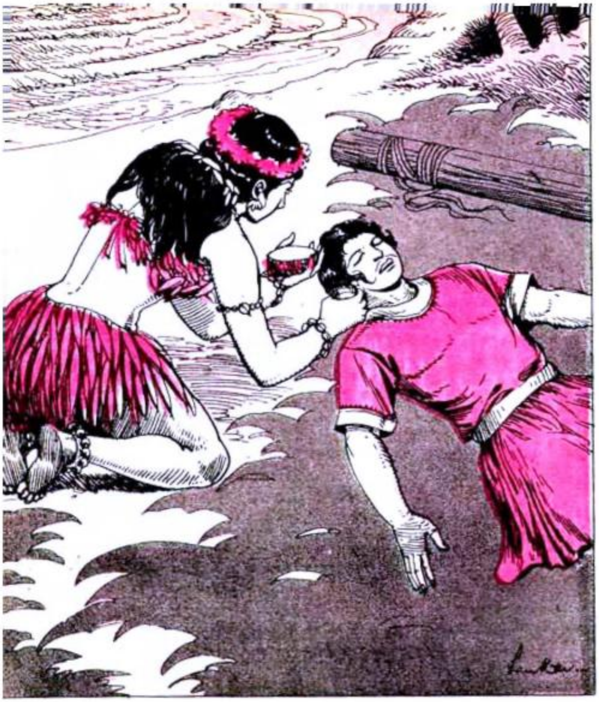

রাজা দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দয়ানিধিকে দেশ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

অগত্যা দয়ানিধিকে দেশ ছাড়ার জন্য দেশের প্রান্তে, সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াতে হল। সমুদ্রতীরে এক সওদাগরের নৌকা ছিল। ঐ সওদাগর দয়ানিধির বাবাকে চিনত। তৎক্ষণাৎ দয়ানিধিকে নিজের নৌকায় তুলে নিল। যেতে যেতে ঐ সওদাগর দয়ানিধিকে অনেক উপদেশ দিল। দুঃখ না করে ব্যবসায় মন দিতে বলল।

কিন্তু দয়ানিধির মত প্রকাশের আগেই সমুদ্রে ঝড় তুফান উঠল। ঐ নৌকা ডুবে গেল। কাঠের গুঁড়িতে দয়ানিধি ভাসল।

দিন সে চিকিৎসা করার নামে হাজার হাজার রোগীকে জড় করছে আত্মপ্রচারের জন্য।

রাজা লোক পাঠিয়ে দয়ানিধির কাছে কত অর্থ আছে, কি কি ধন-সম্পত্তি আছে খোঁজ নিল। নানা অজুহাতে দয়ানিধির চিকিৎসালয় ও সমস্ত সম্পত্তি রাজা অন্যায়ভাবে দখল করে নিল।

এত নিয়েও রাজার শান্তি ছিল না। প্রতিদিন যেহেতু বহু গরিব মানুষ দয়ানিধির কাছে আসত, দয়ানিধির কাছে শুনত যে রাজা দাতব্য চিকিৎসালয় দখল করে নিয়েছে সেহেতু রাজার প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। ক্রমশঃ রাজার প্রতি গরিবদের ঘৃণা বাড়তে লাগল। তখন

পরে দয়ানিধির চেতনা লোপ পেল। অজ্ঞান অবস্থায় দ্বীপের কিনারে পৌঁছে গেল।

সেই দ্বীপে আদিবাসীদের বসতি। দয়ানিধিকে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পেল এক আদিবাসী যুবতী। সে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। জ্ঞান ফেরার পর তাকে খেতে দিল। দয়ানিধি ভালভাবে সেরে উঠল। তাকে ঘিরে বহু আদিবাসী যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভীড়।

তাদের চোখে মুখে দয়ানিধি সম্পর্কে কৌতূহলের ছাপ। ঐ দ্বীপের আদিবাসীরা ওখানকার জমিতে চাষ করে। ওখানকার বনে শিকার করে। বাকল

আর গাছের পাতা তাদের পরিধানে। ওদের মধ্যে উচ্চ নীচের কোন মনোভাব নেই। ক্ষেতের ফসল আর শিকার করা পশুর মাংসে তাদের পেট ভরে।

দয়ানিধি আদিবাসীদের ভাষা শিখে নিল। যে আদিবাসী যুবতী তাকে সমুদ্র-তীরে দেখেছিল, এবং সুস্থ করে তুলেছিল, তাকেই দয়ানিধি বিয়ে করে ফেলল।

ঐ দ্বীপের অধিবাসীদের একটা মারাত্মক রোগ হত। চোখের দৃষ্টি দ্রুত কমে যেত। অন্ধ হয়ে যেত। দয়ানিধি এই মারাত্মক রোগ কবে থেকে শুরু হল তা জানল।

"সাবধান। তুমিও অন্ধ হয়ে যেতে পার।" দয়ানিধির বউ বলল।

"তাতে ভয় পাই না। যে পরিবেশে অসুখ করে সেই পরিবেশে ওষুধও পাওয়া যায়।" দয়ানিধি বলল।

দয়ানিধি আর তার আদিবাসী বউ জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে লাগল। দয়ানিধি যা খুঁজছিল তা পেল।

ওষুধ তেরী করে যার চোখে রোগ ধরে দয়ানিধি তাকে সেই ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তোলে। দয়ানিধির চিকিৎসার ফলে সেখানে আর কেউ অন্ধ হল না।

এতবড় উপকার করায় সেই দ্বীপের অধিবাসীরা দয়ানিধিকে দেবতার মত দেখতে লাগল। আস্তে আস্তে দয়ানিধি নানা রোগের চিকিৎসা করতে লাগল। দেখতে

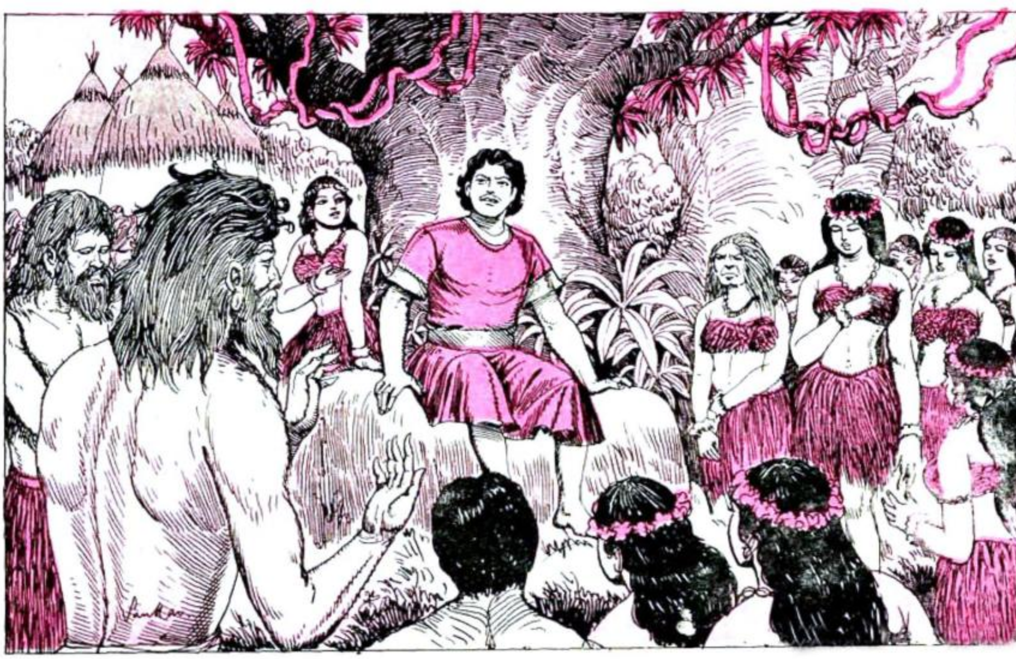

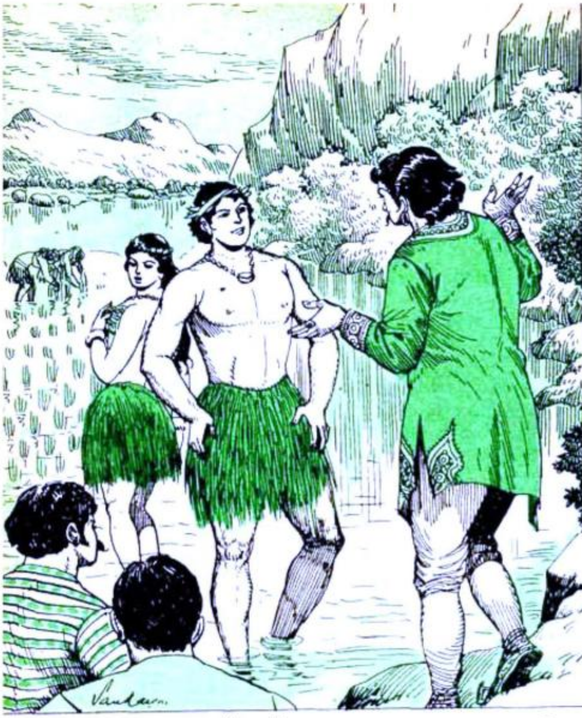

দেখতে সেই দ্বীপে রোগ বলে কোন কিছু ছিল না।

একদিন দয়ানিধি ও তার বউ ক্ষেতের কাজ করছিল। এমন সময় একটি নৌকা সেই সমুদ্রতটে পৌঁছাল। একজন সওদাগর সেই নৌকা থেকে নেমে দয়ানিধিকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি এখনও বেঁচে আছ ? আমরা তো তোমার সম্পর্কে কত কথা শুনলাম। ঐ নৌকা ডুবির পর আর কি কেউ বাঁচতে পেরেছে ?"

দয়ানিধি যা যা ঘটেছিল বিস্তারিতভাবে বলল। তার কথা শুনে সওদাগর বন্ধুটি বলল, "তোমার দেশত্যাগ করার পর দেশে অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা যাকে রাজা মনে করতাম সে তো আসলে ছিল এক বিরাট সম্রাটের অধীনস্থ রাজা। সম্রাট তার লোভ তার অত্যাচার সম্পর্কে গোপনে সব জানতে পারল। তারপর তাকে একদিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। সেই সম্রাট তোমার মত যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সব শাস্তি মকুব করেছে। অতএব তুমি এখন আর দেশদ্রোহী নও। তুমি এখন দেশে ফিরে এস। যে ধন সম্পত্তি ঐ লোভী রাজা দখল করে নিয়েছিল সে সমস্তই তুমি ফেরত পাবে। আগের মত তুমি তোমার সম্পত্তি নিয়ে সুখে জীবন যাপন করতে পারবে। তোমার চিকিৎসালয় আবার চালু করতে পারবে। দেশের মানুষ এখনও তোমায় ভোলে নি। ওরা তোমার কথা বলে। চল, আমার নৌকায় ফিরে চল দেশে।"

দয়ানিধি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সওদাগরের সব কথা শুনল। দেশের কথা। দেশের মানুষের কথা। তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "না বন্ধু এই দ্বীপ ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যাব না। দাঁড়াও, তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সওদাগর বন্ধুটি দয়ানিধির কথা শুনে ভাবল, নৌকাডুবির ফলে দয়ানিধির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তা না হলে কি আর

দয়ানিধি নিজের দেশে ফিরে যেতে চাইত না ? ধনসম্পত্তি ফেরত পেতে চাইত না ?

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, দয়ানিধিতো সহজেই দেশে ফিরে যেতে পারত ? অগাধ ধনসম্পত্তি নিয়ে শেষের জীবনটা সুখেই কাটাতে পারত। এতবড় সুযোগ পেয়েও কেন সে ফিরে গেল না ? সে কি নিজের দেশকে ভালবাসত না ? আদিবাসীদের ঐ অসভ্য জীবনযাত্রা রাতারাতি তার এত ভাল লেগে গেল কেন ? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

এ কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "দয়ানিধির ধনসম্পত্তি বা সুখী জীবনের প্রতি টান ছিল না। তার জীবনে যে দুঃখ দুর্দশা এল তার মূলে ছিল ধন-সম্পত্তি। একমাত্র রোগীদের রোগ সারিয়ে সে আনন্দ পেত। ওর ধনসম্পত্তি যে রাজা দখল করে নিয়েছিল সে রাজা মারা গেলেও যে সব বৈদ্যরা তার বিরোধী ছিল তারা তখনও বর্তমান ছিল। যে সব ধনী দয়ানিধির বিরুদ্ধে ছিল তারাও বহাল তবিয়তে সেই দেশে বেঁচে ছিল। তাই তার মাতৃভূমি তার মনের ভূমি ছিল না। তাই দেশের মাটি তাকে টানতে পারেনি। অপর পক্ষে আদিবাসীদের মধ্যে কোন ধনী-গরিব ছিল না। সে যাদের রোগ সারাত তারা দুহাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করত। সেই দ্বীপে কোন রাজা ছিল না। কোন সম্রাটেরও অধীনে ছিল না সেই দ্বীপ। ওখানকার মানুষ যে যতটা পারে পরিশ্রম করত। ফল যা পেত ভাগ করে খেত। এসব দয়ানিধির ভাল লেগেছিল। তাই দয়ানিধি ঐ দ্বীপেই রয়ে গেল।"

রাজার এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল ঐ গাছে। (কল্পিত)

# কে বড় ?

এক গ্রামে রসরাজ ও রমা নামে এক দম্পতি ছিল। রমা ঝগড়ুটে আর রসরাজ ছিল খুব রাগী। ওদের দুজনে সব সময় ঝগড়া করত। রমা বলত আমি বড়, রসরাজ বলত আমি বড়।

দুজনের ঝগড়া বাড়িতে মিটল না। গেল গাঁয়ের মোড়লের কাছে। বলল, "আপনিই বিচার করে বলে দিন সংসারে স্ত্রী বড় না স্বামী বড়।"

মোড়লের মাথায় অন্য বুদ্ধি ঢুকল। সে একটি গল্প বলল।

"একবার এক দম্পতি দূরে কোথাও যাত্রা করল। পথে ক্লান্ত হয়ে স্বামী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে ঘুমোল। স্ত্রী হঠাৎ দেখতে পেল একটা ডাল ভেঙ্গে পড়ছে। সে তৎক্ষণাৎ নিজের মাথার চুল ছুঁড়ে দিল উপরের দিকে। ব্যাস আর ঐ ডাল পড়তে পারল না ঐখানে। দূরে পড়ল। এবার তোমরাই বল কে বড়, স্বামী না স্ত্রী ?" মোড়ল বলল।

"এতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে স্ত্রী বড়।" রমা বলল। "আর এহেন বড় স্ত্রীর সেবা যে পাচ্ছে সে কি ছোট ? না। সেই বড়।" রসরাজ বলল।

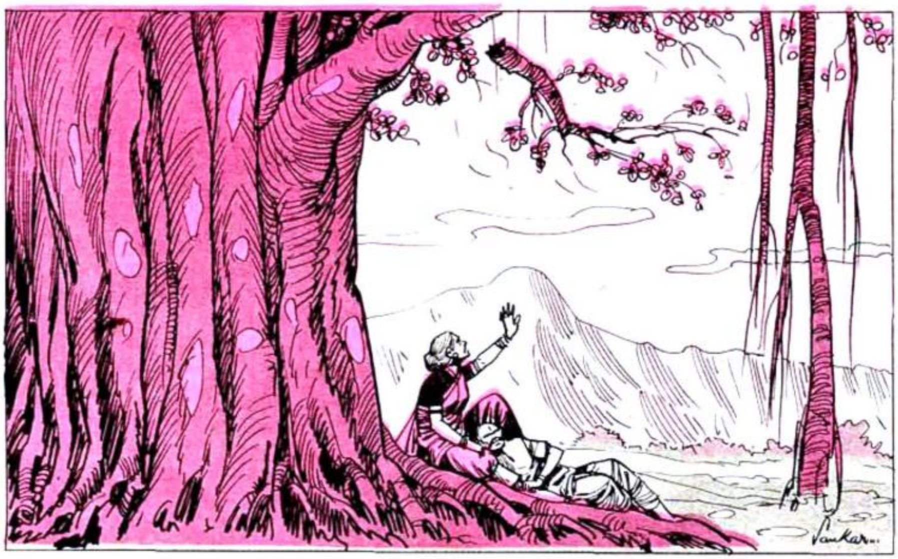

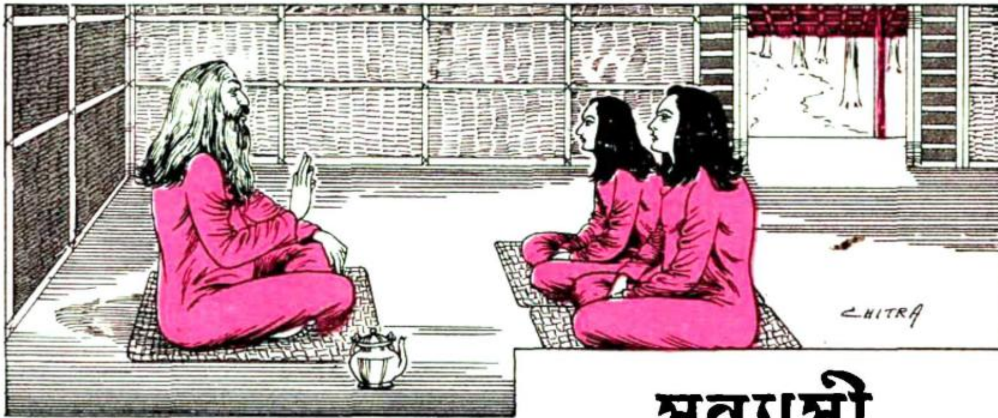


# সন্ন্যাসী

এক গ্রাম ছিলেন এক সন্ন্যাসী। ঐ সন্ন্যাসীর লোভ, রাগ প্রভৃতি রিপু ছিল না। তাঁর ছিল দুজন শিষ্য। এক-জনের নাম আনন্দ। অন্যজনের নাম ভৈরব। ঐ দুজন শিষ্য যেদিন সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিল সেই দিনই তিনি তাদের দুটো নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। প্রথম কোন মহিলার গায়ে হাত দেবে না। দ্বিতীয়ঃ বিপদে পড়া মানুষকে উদ্ধার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

সন্ন্যাসী তাঁর নির্দেশের ব্যাখ্যা করে বললেন যে প্রথম নির্দেশ পালন করলে দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় নির্দেশ পালন করলে জীবন সার্থক হয়। সন্ন্যাসীর দুটো নির্দেশ শিষ্য দুজন মনের গভীরে গেঁথে রাখল।

প্রত্যেকদিন ওরা তিনজনে নদীতে স্নান করে ফিরতেন। নদীতে যাওয়ার পথেও সন্ন্যাসী শিষ্যদের নানা জিনিস সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। স্নানের পর তাঁরা একত্রে ভিক্ষা করতে বেরুতেন। ভিক্ষা যা পেতেন তাই সেবেলা পাক করে খেতেন। দুপুরে শিষ্যরা যে যার পাঠ অধ্যয়ন করত। সন্ধ্যের সময় আবার তাঁরা তিনজনে মিলে নদীতে যেতেন স্নান করতে। স্নানের পর ভিক্ষা করে পাক করে খেতেন।

প্রত্যেকদিনের মত সেদিনও সন্ন্যাসী, আনন্দ ও ভৈরব তিন জনে তিন পথে ভিক্ষে করতে বেরুলো। আনন্দ একটু এগোতেই দেখতে পেল একটি বালক ডুকড়ে ডুকড়ে কাঁদছে। আনন্দ তাকে জিজ্ঞেস করল, "কাঁদছ কেন খোকা, কি হয়েছে?"

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

প্রশ্নের জবাবে ছেলেটি বলল, "আমি এক ধনীর পরিবারে চাকরি করি। আমার মালিক আমার হাতে একটা সোনার মালা দিয়ে স্যাঁকরার কাছ থেকে ঠিক করিয়ে আনতে বললেন। আমি সোনার হার নিয়ে একটু এগোতেই একটা চোর আমার হাত থেকে মালাটা কেড়ে নিয়ে পালাল। মালিকের কাছে গিয়ে সত্য কথা বললে আমার পিঠের চামড়া আর থাকবে না।"

আনন্দ ছেলেটার কাছ থেকে জেনে নিল চোর কোন দিকে গেছে। তার পরণে কি ছিল। ছেলেটাকে নিয়ে চোর যে দিকে গেল আনন্দও সেই দিকে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর ছেলেটি চিৎকার করে বলল, "ঐ লাল ধুতী পরা লোকটাই চোর। ঐ হার কেড়ে নিয়েছে।"

তার গলা পেয়েই চোর ছুটতে লাগল। আনন্দও তার পিছনে ছুটতে লাগল। ততক্ষণে ভৈরব সেখানে পৌছে গেল। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে আনন্দের ছোটার কারণ জানতে পারল।

ভৈরব ভাবল, আনন্দ হয়ত সোনার হারে হাত দেবে। সে পিছনে ছুটল।

চোর ছুটতে ছুটতে একটা খালের পারে এসে থেমে যায়। ঐ খাল লাফিয়ে পার হতে পারল না। চোর ভাবতে লাগল। আনন্দ চোরকে ধরে ফেলল। চোর সোনার হার আনন্দের হাতে দিয়ে

প্রণাম করে ক্ষমা চাইল। আনন্দ তাকে ছেড়ে দিল।

ততক্ষণে ভৈরব আনন্দের কাছে পৌঁছে গেল। ভৈরব আনন্দের হাতে সোনার হার দেখে বলে উঠল, "একি করলে! সোনায় হাত দিতে গেলে কেন?"

আনন্দ জবাব দিতে যাবে এমন সময় নারীর আর্তনাদ শোনা গেল। আনন্দ তাকিয়ে দেখে ওপার থেকে এক যুবতী চিৎকার করে খাল পার করে দিতে বলছে।

যুবতীকে দেখেই ভৈরব মুখ ঘুরিয়ে নিল। যুবতীকে তুলে ধরে খালে নেমে এই পারে এল। যুবতী আনন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে গেল নিজের পথে।

ভৈরব আনন্দের সঙ্গে কথা বলল না। অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আনন্দ আবার একটি যুবতীকে দুই হাতে তুলে খাল পার করাল!

আনন্দের কিন্তু ভৈরবের চিন্তা ভাবনার দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে সোনার হার ছেলেটিকে দিয়ে ভিক্ষে করতে চলে গেল।

সেদিন ভৈরব তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরল। সন্ন্যাসীকে সব কথা জানাল।

সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে বললেন, "আচ্ছা আনন্দ আসুক। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি ওকি বলে।"

আনন্দ ফিরতেই সন্ন্যাসী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আনন্দ, আমি তোমাকে যে

নির্দেশ দিয়েছিলাম তা তুমি মনে রেখেছ ? তোমার জীবনে তার প্রয়োগ কর ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মনে রাখি। প্রয়োগ করি।" আনন্দ বলল।

"আজ যা করেছ তাতে কোন ব্যতিক্রম হয়নি তো ?" সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন।

"আজ আমি বিপদে পড়া দুজনকে সাহায্য করেছি।" আনন্দ জবাব দিল।

"ওরা দুজন কারা ?" সন্ন্যাসী আবার প্রশ্ন করলেন।

"ওরা যে কারা আমি ঠিক তা জানি না। একজন বিপদে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। অন্যজন আমার সাহায্য চেয়েছিল। এই দুজনকেই আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। তারপর ওরা যে যার পথে চলে গেছে। আমি খোঁজ করিনি ওরা কোথায় গেছে।" আনন্দ বলল।

"ঠিক আছে। যাও হাত পা ধুয়ে এসো। খেতে বসব।" একথা বলে আনন্দকে পাঠিয়ে সন্ন্যাসী ভৈরবকে বললেন, "দেখ ভৈরব দেখলাম আনন্দই সত্যিকারের সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছে। আমি যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তার মর্মার্থ আনন্দ সঠিক বুঝেছে। নারীর গায়ে হাত দিতে বারণ করার অর্থ ও বুঝেছে। তার মনে নারীর প্রতি কোন আকর্ষণ জন্মায় নি। সোনায় হাত দিতে বারণ করার অর্থ সোনার প্রতি যেন কোন সন্ন্যাসীর আকর্ষণ না জাগে। এখন তুমি নিজের কথা ভেবে দেখত। তুমি সোনায় হাত দাও নি কিন্তু তোমার মন থেকে ঐ সোনার হারের স্মৃতি মুছে যাচ্ছে না। যুবতীর কথা বার বার তোমার মনে পড়ছে। এটাই তো খারাপ লক্ষণ।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনে ভৈরব নিজের ভুল বুঝতে পারল। লজ্জায় মাথা নিচু করে সে অপরাধীর মত গুরুর সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

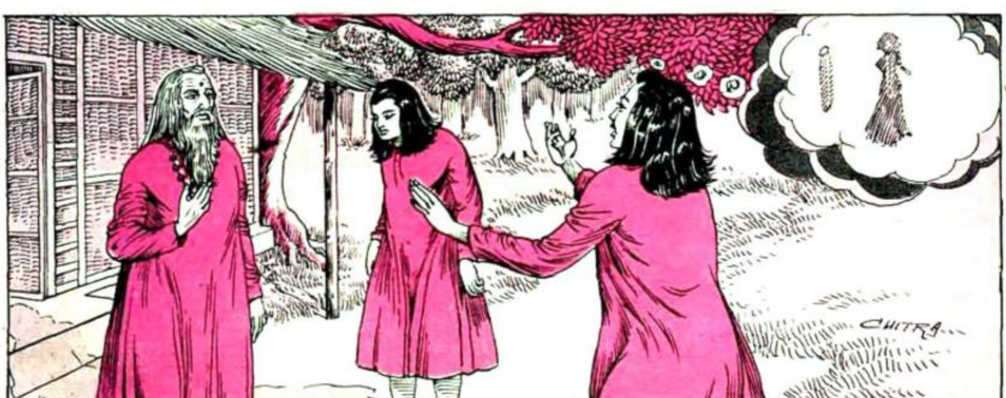

# সোমশর্মা

রাজা ভোজের বহু কবি ছিলেন। তিনি যে শুধু সভা কবিদের জন্যই প্রচুর অর্থ খরচ করতেন তাই নয় যে সব কবি তাঁর সভায় আসতেন তাঁদেরও রাজা প্রচুর অর্থ ও উপহার দিয়ে খুশী করতেন। কবি কালিদাস আবার বহু মূর্খ পণ্ডিতদেরও পণ্ডিত প্রমাণ করে পাইয়ে দিতেন। ফলে তিনি বহু মূর্খ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আশীর্বাদ ও প্রশংসা পেতেন। আর দরিদ্র ব্রাহ্মণরা ভোজ রাজার কাছ থেকে পাওয়া উপহার দিয়ে বহুদিন খেতে পরতে পারত।

এই ধরণের নিরেট মূর্খ ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন ছিল সোমশর্মা। সে ছিল অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ। একমাত্র ভিক্ষা করেই তাকে পেট চালাতে হত। কাদের কাছে জানতে পারল যে অনেক মূর্খ ব্রাহ্মণকেও মহাকবি কালিদাস উপহার পাইয়ে দেন। সে গেল কালিদাসের কাছে। নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা জানাল। রাজার কাছ থেকে কিছু পাইয়ে দেবার অনুরোধ করল মহাকবির কাছে।

"তুমি কি লেখাপড়া কিছুই কর নি?" মহাকবি কালিদাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

সোমশর্মা লজ্জিত হয়ে বলল, "আজ্ঞে আমি কোন লেখাপড়া করিনি। রাজদরবারে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি কথা বলার যোগ্যতাও আমার নেই। এখন আপনি যদি কিছু না করেন তো বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাব।"

"কি করি। তুমি কি জান না যে রাজা ভোজ শুধু শিক্ষিতদেরই আদর অভ্যথনা

অনির্বাণ পাল

করেন ? তবে তুমি যদি আমার কথা মত কাজ কর তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। রাজা যখন ডাকবেন তখন তুমি যাবে। একটা কতবেল তাঁর সামনে রেখে তাঁকে আশীর্বাদ করে বলবে, 'গারায়ঃ'।"

রাজা ভোজের মেজাজ যখন ভাল ছিল তখন তিনি বললেন, "মহারাজ এক মহান শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত আমাদের রাজধানীতে এসেছেন শুনেছি। আপনি কি ডেকে পাঠাবেন তাঁকে ?" রাজা তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে সোমশর্মাকে আনালেন। সোমশর্মা একটা উট দেখে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি ?"

ওরা বলল, "এর নাম উষ্ট্রম্।"

মূর্খ সোমশর্মা উটকে দেখে কালিদাসের কথা ভুলে গেল। অনেক চেষ্টা করে যখন তার মনে পড়ল তখনও সে উটের কথা ভুলতে পারল না। ফলে রাজার সামনে কতবেল রেখে সোমশর্মা বলল, "উশরট গারায়ঃ।"

সোমশর্মার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে রাজদরবারের সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। রাজা ভোজ কালিদাসকে এই কথার অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। তখন মহাকবি কালিদাস একটি শ্লোক শোনালেন

"উময়া সহিতো দেব<br>শ্ শঙ্কর শ্ শূলপাণিনা<br>রক্ষতু ত্বাং হি রাজেন্দ্র !<br>টকারো ঘনগর্জনঃ।"

অর্থাৎ উ (উমা)র সঙ্গে মিলিত হয়ে শ (শঙ্কর)র (রক্ষা করুন!) ট (টটট) গর্জিত মেঘ বর্ষণ মুখরিত হোক। ঠিক সেই ভাবে আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক বলে মহাপণ্ডিত আশীর্বাদ করছেন।

রাজা এই ব্যাখ্যা শুনে খুব খুশী হয়ে সোমশর্মাকে অনেক উপহার দিয়ে বিদায় করলেন। সোমশর্মা মহাকবি কালিদাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সুখে জীবন যাপন করতে লাগল।

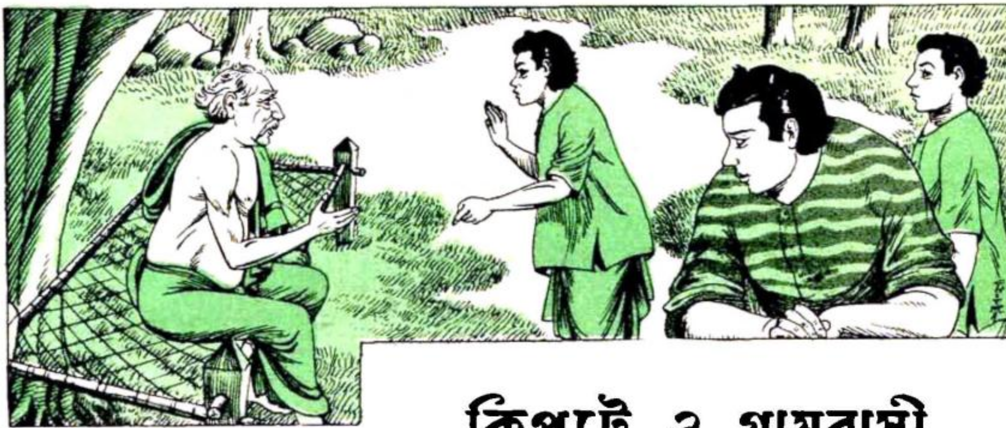

# কিপ্‌টে ও গ্রামবাসী

কোশিল গ্রামে রামদাস নামে এক কিপটে ছিল। গ্রামের লোককে ধার দিত। সুদের হার ছিল বড্ড বেশি। তার কাছে সবার উপরে টাকা সত্য। যারা ঠিক সময়ে ধার শোধ করতে পারত না তাদের ঘর-বাড়ি বিষয় সম্পত্তি দখল করে নিত।

যত কম খরচে পারল মেয়ের বিয়ে দিল। আর বিয়ের পর একদিনও মেয়ে জামাইকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল না।

রামদাসের বউ একবার অসুখে পড়ল। বৈদ্য ডাকা তো দূরের কথা অসুখের অজুহাতে তাকে খেতে দিল না। বউ মারা গেল।

বুড়ো বাপের প্রতিও তার কোন টান ছিল না। বুড়ো বয়সে অসুখ করল। রামদাস বাপকেও খেতে দিল না। শেষে রামদাসের বাবা না খেতে পেয়ে মারা গেল।

অন্যদের খেতে দেবে কি, নিজেই দুবেলা খেতো না। শুধু এক বেলা আধ-পেটা খেয়ে থাকত। ঠাকুর্দার আমলের ঘর-বাড়িও সারাতো না।

এহেন জঘন্য ধরণের রামদাসের সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের খটামটি লেগেই থাকত। নেহাৎ ঠেকলে টাকা ধার করতে আসত।

রামদাসের বাবা না খেতে পেয়ে অসুস্থ অবস্থায় ধুঁকতে ধুঁকতে যখন মারা গেল তখন থেকেই গাঁয়ের লোক চটে ছিল। ওরা রামদাসকে জব্দ করার পরিকল্পনা করল। ওদের পালের গোদা ছিল সোমনাথ। সোমনাথ তার মামার কাছে জাদু বিদ্যা শিখেছিল। সে এক অপূর্ব জাদুর সাহায্যে রামদাসকে জব্দ করার তাল করল। তার পরিকল্পনা সকলের কাছে ভাল লাগল।

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

"সোমনাথ তুমি যা করতে চাইছ তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে কথা কি জান, রামদাস পয়সাওলা লোকতো, আর জানইতো পয়সা যার জোর তার।" গাঁয়ের বয়স্ক একজন বলল। নাম তার রঘুপতি।

"না তেমন কোন ভয়ের কারণ নেই। আমি এমন কিছু করব না যাতে রামদাসকে টাকার জোর খাটাতে হয়। আমার কাজ রামদাসের বাবাই ভূত হয়ে করে ফেলবেন। বুড়ো বাপকে রামদাস ভয় না পেলেও তার বাবা যখন ভূত হয়ে কিছু বলবে তখন আর তা না করে পারবে না। এই সুযোগে আমরা গাঁয়ের মানুষের উপকারার্থে কিছু কাজ করিয়ে নিতে পারি।" সোমনাথ বলল।

"সেকি! তা কি করে সম্ভব?" সবাই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

সোমনাথ গোপনে কিছু বলল।

যারা শুনল তাদের মনে হল সোমনাথের পরিকল্পনা মত কাজ হতে পারে। পাঠ-শালার জন্য একটা বাড়ি তৈরি করানো যেতে পারে রামদাসকে দিয়ে।

রামদাসের বাবাকে গ্রামের বাইরে মুক্তাপুর যাওয়ার পথে একটা বটগাছের কাছে পোড়ানো হয়েছিল। রামদাস সুদ আদায় করতে মুক্তাপুরে গিয়েছিল। ফিরতে রাত হয়ে গেল। জ্যোৎস্না রাত। সেদিন আদায় ভালই হয়েছিল। তাই নির্জন পথে উঁচু গলায় গান গাইতে গাইতে

ফিরছিল। ঐ বটগাছের কাছাকাছি আসতেই তার আরও বেশি করে ভয় করতে লাগল। ফলে আরও জোরে জোরে গান গাইতে লাগল। ঐ গাছের কাছে এসে পৌঁছাতেই গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে পড়ল। রামদাসের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। পরক্ষণেই ডালপালার ফাঁকে দেখতে পেল একটি সাদা জিনিস নড়ছে। এসব দেখে রামদাস ভয়ে কাঁপতে লাগল।

ঠিক সেই সময় ভারি গলায় শোনা গেল মানুষের কথা, "রামদাস, আমি তোমার বাবা কথা বলছি! তোমার অপকর্মের জন্য মরেও শান্তি পাচ্ছি না। বাপের প্রতি তুমি তোমার কর্তব্য পালন করনি। তাই আমার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না। আমার শ্রাদ্ধ ঠিকমত করনি। সব কাজে কিপটেমি করলে কি চলেরে বাবা! এক কাজ কর নামকরা পুরুত ঠাকুর গৌতম ভট্টকে ডেকে আমার শ্রাদ্ধের কাজ করাও। গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। যত দিন না তৃষ্ণা মিটছে ততদিন আমি ছটফট করতে থাকব। বাবা, আমি শান্তি না পেলে তুমি কি করে শান্তি পাবে!"

রামদাসের গলাও শুকিয়ে আসছিল। সে বলল, "গৌতম ভট্টকে আনিয়ে শ্রাদ্ধের কাজ করানো মানে তো অনেক খরচের মধ্যে পড়া। অত টাকা খরচ করতে পারব না। এখন আমার হাতের টান আছে।"

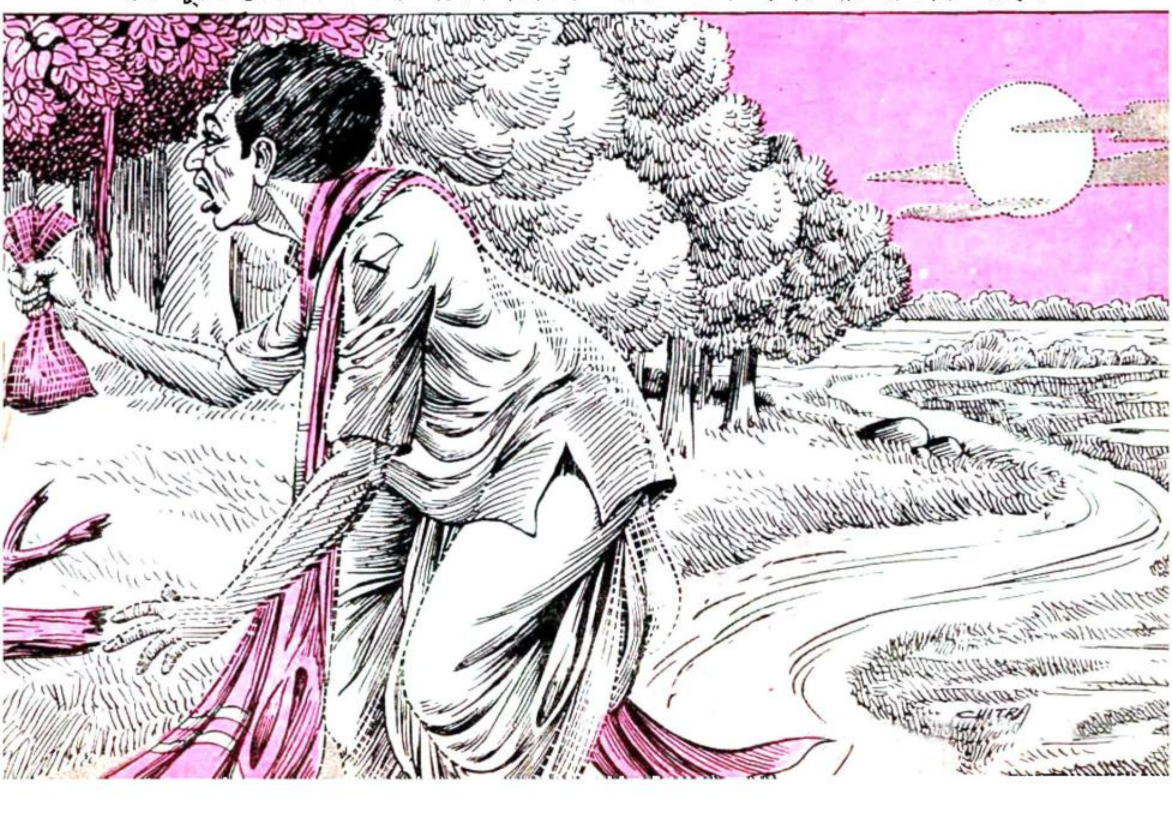

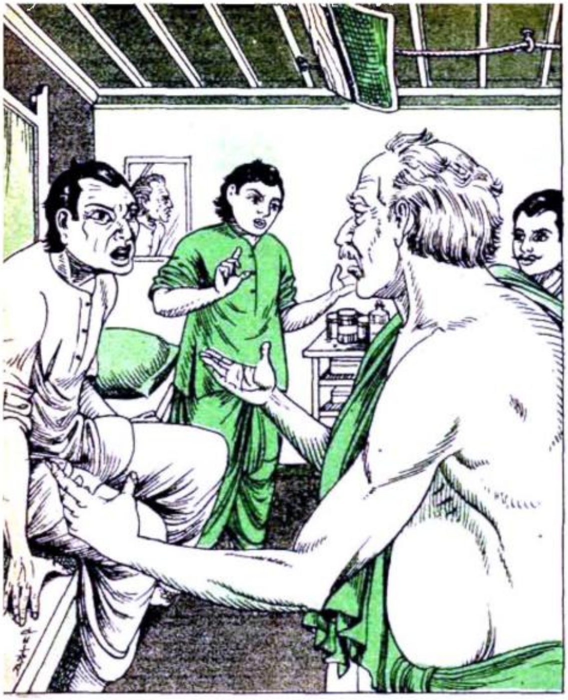

"পারবে না ? একথা তুমি বলতে পারলে ? তাহলে তুমি বুঝবে এর ফল।" আর একটা ডাল ভেঙ্গে পড়ল তার সামনে। রামদাস ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

"আমার কথা মত কাজ না করলে আমি তোমার ঘাড় মটকাতে বাধ্য হব। তুমি আমার আত্মার শান্তি বিধান না করলে আমিই বা তোমাকে ছেলে হিসেবে গণ্য করব কেন ? তোমার প্রতি আমার দয়া, মায়া, স্নেহ মমতা কিছুই থাকবে না।" প্রচণ্ড আক্রোশে ঐ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ঐ কথা শুনে রামদাস জ্ঞান হারালো। তারপর রঘুপতি ও কয়েকজন যুবক এগিয়ে এসে রামদাসকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে সোমনাথ ও তার সাথী দেবাশীষ গাছ থেকে নেমে এল। ওদের হাতে করাত, সাদা ঘুড়ি ও চোঙ্গা ছিল। গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ঐযে সাদা জিনিস দেখা যাচ্ছিল সেটাই ছিল সাদা ঘুড়ি। করাত দিয়ে গাছের ডাল কেটে ফেলা হয়েছিল। আর চোঙ্গায় কথা বলায় অন্যরকম ও ভারি শোনাচ্ছিল।

বাড়িতে এনে রঘুপতি বৈদ্য ডেকে পাঠাল। বৈদ্য রামদাসের হাত বুক চোখ প্রভৃতি দেখতে লাগল। পরীক্ষা করতে লাগল। টুকটাক ওষুধ দিল বদ্যি। রামদাস জোরে হাঁচি ফেলল। চোখ খুলে তার চারদিকে লোকজন দেখে সে বলল, "একি আমি কোথায় ? আমার কি হয়েছে ?"

"কোথায় আছেন বুঝতে পারছেন না। আপনার কি হয়েছে তা আমরা জানব কি করে! আপনার চিৎকার আর্তনাদ শুনে আমরা ছুটে গিয়ে দেখি আপনি মাটিতে পড়ে আছেন।" রঘুপতি বলল।

"থামলেন কেন। আমরা গিয়ে রামদাসবাবুকে কি অবস্থায় দেখেছি তাও জানান। রামদাসের বাবা যে কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাও জানান।" সোমনাথ বলল।

"আর বাবা, সব কি এই অবস্থায় ঠিক মনে থাকে। তারপর তোমার গায়ে হাত দিয়ে তো আমাদের মনে হল তুমি মরেই

গেছ। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তোমার শরীর। কাঠ হয়ে গেছে গোটা দেহটা। এমন সময় তোমার বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রঘুপতি, তোমরা সরে যাও এখান থেকে। যে ছেলে আমাকে বেঁচে থাকতে খেতে দেয়নি, পরতে দেয়নি, মরে গেলে যে ছেলে আমার শ্রাদ্ধও ভালভাবে করেনি, সে ছেলেকে তোমরা আর বাঁচাতে এসো না। যাও, আমি এই মুহূর্তে ওকে শেষ করে ফেলব। একে এখন তোমরা নিয়ে গেলেও একে তোমরা বেশিদিন বাঁচাতে পারবে না। কি হবে এই ধরণের ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখে! যে ছেলে না খাইয়ে অসুখে ফেলে মেরে ফেলল নিজের বউকে। যে ছেলে আমাকে ঐ ভাবে দিনের পর দিন না খাইয়ে মারল, যে ছেলে গাঁয়ের একটা লোকেরও উপকার করল না, যে ছেলে গাঁয়ে একটা ভাল কাজ করল না, তাকে বাঁচিয়ে রেখে বাপেরই বদনাম। তাই আমি ঠিক করেছি যেমন একদিন আমি তাকে পৃথিবীতে এনেছি ঠিক তেমনি একে নিয়ে যাব পৃথিবী থেকে। তোমরা কয়দিন ওকে বাঁচাতে পারবে। আমার হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারবে না।' একথা বলে তোমার বাবা গাছে উঠে গেলেন। ডালপালা নড়ে উঠল। পাতা খশ খশ করল। আর কিছু দেখা গেল

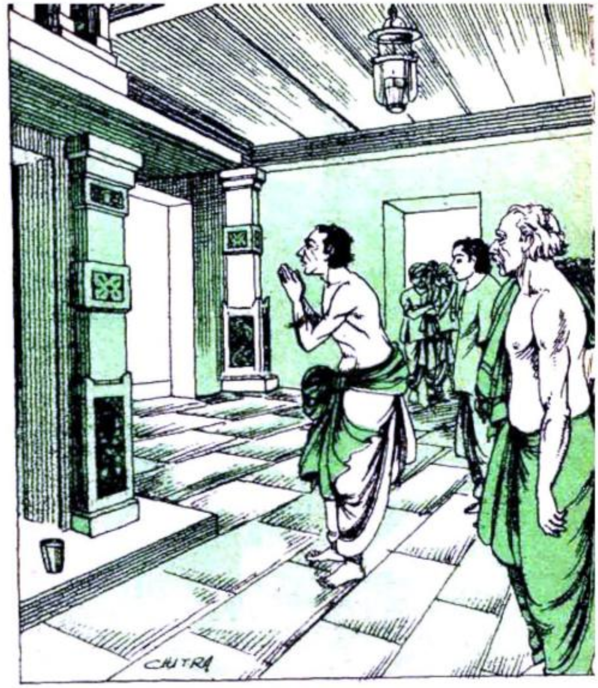


না। আমরা তোমাকে নিয়ে চলে এলাম।" রঘুপতি বলল।

রামদাস ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, গৌতম ভট্টের বাড়ি কোন্ দিকে? আমার সঙ্গে কেউ চলুন না। কাল পরশু যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বাবার শ্রাদ্ধ করিয়ে দেব। বাবার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না যে!"

খুব খরচ করে রামদাস বাপের শ্রাদ্ধ করল। সারা গাঁয়ের লোক নিমন্ত্রণ খেল। শ্রাদ্ধের কাজ শেষ করে ঘটি করে জল এনে মন্দিরে রেখে বাপকে স্মরণ করে বলল, বাবা যেন জল খেয়ে নেয়। এই জল খেয়ে বাবা যেন তৃষ্ণা মেটায়। কিন্তু

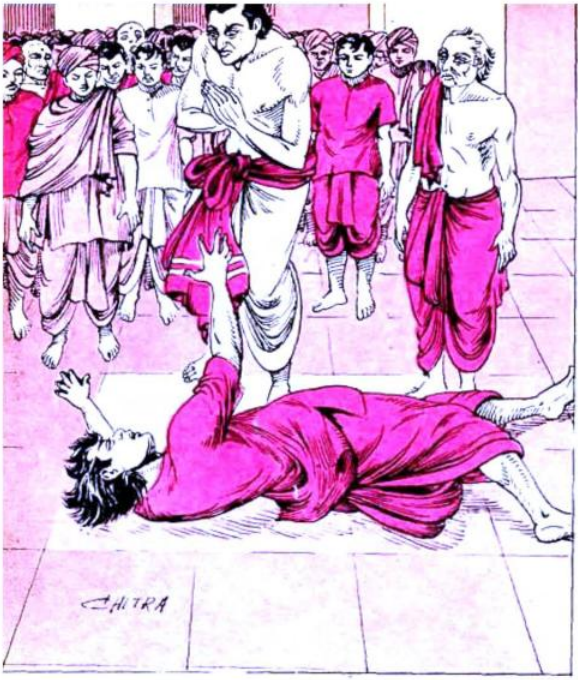

ঘটি ভর্তি জল যেমনকে তেমনি রয়ে গেল। রামদাস ভাবল, তাহলে তো বাবার আত্মা জল খাচ্ছে না। শান্তি হয়নি নিশ্চয়। এখন উপায়! নিশ্চয় আরও কিছু কাজ বাকি আছে তা না করলে বাবার আত্মা শান্তি পাবে না।

ঠিক সেই সময় দেবাশীষ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "সোমনাথ আপনার বাড়ির সামনে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর কি যেন রামদাস, রামদাস বলে বিড় বিড় করছে। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। রঘুকাকা আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন।"

রামদাস ছুটে গেল। সোমনাথ ঐভাবে বিড় বিড় করছে। সোমনাথ রামদাস যাওয়ার পর ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "ওরে রামদাস, বাবা, শুধু আমার শ্রাদ্ধ করলেই কি আর আমার আত্মার শান্তি হবে রে! এই শ্রাদ্ধের কাজে কেন যে নিজের মেয়ে-জামাইকে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করলে না বাবা আমি তা বুঝতে পারি না। এখন আমার নামে যদি একটা কোঠা বাড়ি করে পাঠশালা করে দাও তাহলে আমার ইচ্ছা পূরণ হয়। একাজ করলেই আমার আত্মা শান্তি পাবে বাবা।"

কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকাল। সেও রামদাসের মত বলল, "আমি কোথায়? তোমরা এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমার কি হয়েছে?"

সোমনাথ সুস্থ হয়ে ওঠার পর রামদাস বলল, "বাবা কি তোমাকে জানিয়েছে কিভাবে তাঁর আত্মার তৃষ্ণা মিটবে?"

"আগে উনি যা করতে বলেছেন তা করুন তারপরের কথা পরে।" সোমনাথ গম্ভীরভাবে বলল।

রামদাস তৎক্ষণাৎ গাড়ি পাঠিয়ে মেয়ে-জামাইকে আনাল। পাঠশালা বানানোর ভার দিল রঘুপতির উপর। তাকেই সব দেখাশোনা করতে হবে। খরচ যা লাগে দেবে রামদাস। হিসেব কষে দেখা গেল খরচ পড়বে ত্রিশ হাজার টাকা। আর

পাঠশালার নাম হবে রামদাসের বাপের নামে "মদন স্মৃতি পাঠশালা।"

সব কাজ শেষ করে পরীক্ষা করে দেখার পালা মদনের আত্মা জল পান করে কিনা। এ কাজের উদ্যোগ নিল সোমনাথ। একটা থালায় করে মন্দিরের সামনে জল রাখল। কিছুক্ষণ মন্ত্র পাঠ করে ঐ থালায় একটি পাত্র উল্টে রাখল। মুহূর্তে থালার জল সব শেষ হয়ে গেল চোঁ করে জল খাওয়ার আওয়াজও বেশ জোরেই শোনা গেল।

তারপর সোমনাথ হাতে করে সেই থালা রামদাসকে দেখাল। মন্দিরের ভিতর ঢুকে আবার থালা আর ঐ পাত্র নিয়ে ফিরে এল সোমনাথ।

সেই আওয়াজ শুনে রামদাস বুঝল যে তার বাবার আত্মা ঐ থালার জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। আর কোন বিপদের ভয় নেই।

এদিকে সোমনাথ যা করেছিল তা বেশ মজার ব্যাপার। পাত্রের ভিতরে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি বসিয়ে রেখে দিল। মোমবাতি জ্বলতে থাকায় সেই পাত্রের ভিতরের হাওয়া হাল্কা হয়ে পাত্রটি গরম হয়ে গিয়েছিল। ঐ অবস্থায় সেই উত্তপ্ত পাত্রটা থালার জলে উপুড় করে রাখাতে চোঁ করে একটা শব্দ হল এবং থালার জল ঐ পাত্রে উঠে গেল। রামদাস এই আওয়াজ শুনেই ভেবেছিল তার বাবার আত্মা জল পান করছে।

সোমনাথ যেভাবে পরিকল্পনা করেছিল সেই ভাবেই কাজ হল। ফলে গাঁয়ের লোক মনে মনে হাসতে লাগল এবং সোমনাথকে প্রশংসা করতে লাগল। গাঁয়ের পাঠশালায় বহু ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেল। এ সব কিছুর পর রামদাসের মধ্যেও একটু একটু পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল।

# মানুষের দাম

দ্বারকায় রামেশ্বর নামে এক ধনী ছিল। সে এমন সব কাণ্ড করত যাতে লোকে তাকে ভক্ত ও ধর্মাত্মা বলে মনে করে। আসলে লোকটা ছিল খুব কৃপণ।

একদিন রামেশ্বর মন্দিরের পাশের পুকুরে স্নান করতে নাবল। পা হড়কে গভীর জলে ডুবে গেল। লোকটা সাঁতার জানত না। ফলে ডুবছিল আর ভাসছিল। পুকুরের চারদিকে লোক জমে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ কৃপণ লোকটাকে বাঁচাতে কেউ জলে নাবল না।

এক সন্ন্যাসী জলে ঝাঁপ দিয়ে তাকে বাঁচাল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে রামেশ্বর জানতে পারল যে এক সন্ন্যাসী জল থেকে তুলে তাকে বাঁচিয়েছে। সে ঐ সন্ন্যাসীকে মাত্র চার আনা পয়সা দিতে গেলে কাছাকাছি দাঁড়ানো লোকগুলো রামেশ্বরের কিপটেমিতে রেগে গিয়ে তাকে তুলে ঐ পুকুরেই ছুঁড়ে ফেলতে উদ্যত হল। সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা রাগ করছেন কেন? ওর জীবনের যা দাম সে তাই আমাকে দিচ্ছে। বেচারা চার আনা দামের লোকটাকে ছেড়ে দিন।

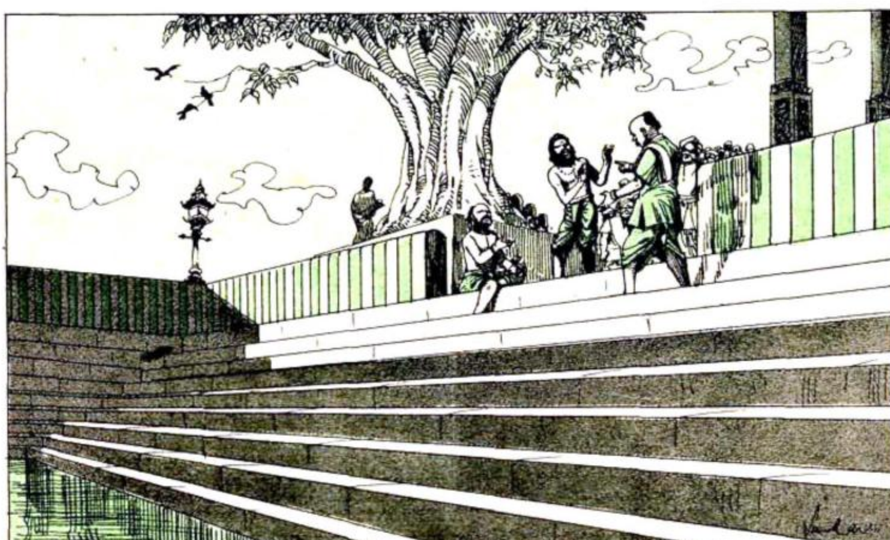

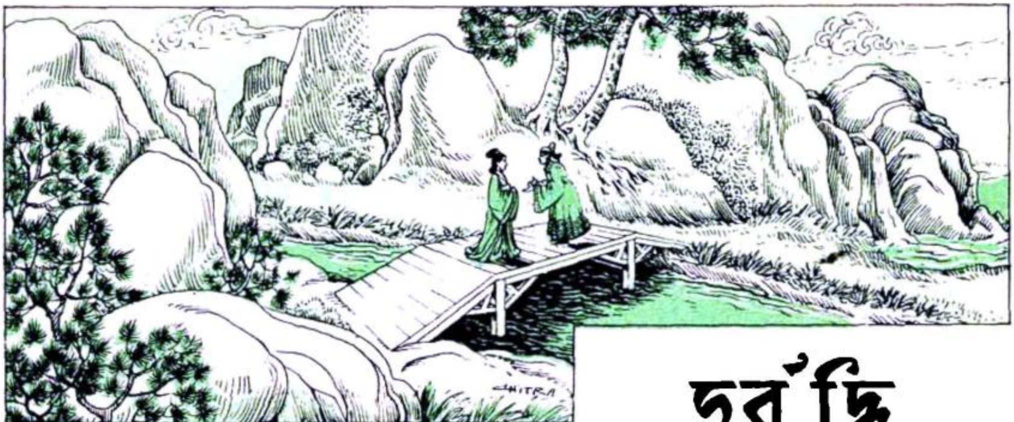

# দুর্বুদ্ধি

প্রাচীনকালে চীন দেশের রাজার ছিল চার ছেলে। চার ভাইয়েরই বিয়ের বয়স হল। ঠিক হল বড় ভাইয়ের সঙ্গে রাজকুমারীর, মেজ ভাইযের সঙ্গে সেনাপতির কন্যার, আর সেজ ভাইয়ের সঙ্গে মন্ত্রীর কন্যার বিয়ে হবে। ছোট ভাইয়ের বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। তাকে বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করলে সে বলত, "বিয়ে যদি করতেই হয় গন্ধর্ব কন্যাকে করব।"

তিন ভাইয়ের বিয়ে হল রাজমহলে। বিয়ের জাঁকজমক ও আমন্ত্রিতদের ভীড় দেখে ছোট ভাই ভাবল এ সবের মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। তিন ভাইয়ের বিয়ের হৈ চৈ আর কোলাহল সহ্য করতে না পেরে সে ক্ষেতের পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

ক্ষেত পেরোতেই একটা সাঁকো পড়ল। সেই সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে সে জলের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল এক অপূর্ব সুন্দরীর প্রতিচ্ছবি। তার মনে হল, এমন সুন্দরী বুঝি স্বর্গেও মেলা ভার। যার ছবি জলে পড়েছিল, সে ছিল তার পাশেই দাঁড়িয়ে। ছোট ভাই কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে বিয়ে করবে?"

সুন্দরী ছোট ভাইয়ের প্রস্তাবে রাজী হল। রাজী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভীষণ আনন্দ হল। তাকে পাল্কী করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছোট ভাই ছুটে গেল রাজমহলে। সেখানে চিৎকার করে বলল, "আমি বৌ পেয়ে গেছি।" কিন্তু বিয়ের হৈ চৈ-এর মধ্যে তার কথা লোকের

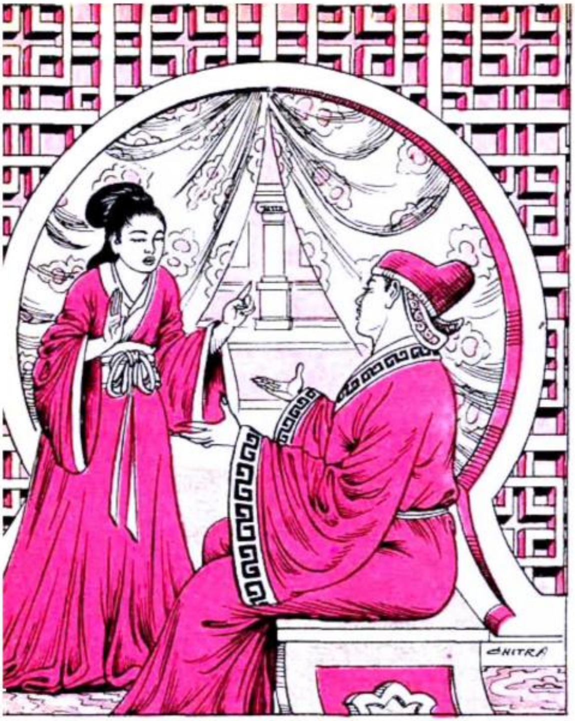


কানে যেন ঢুকল না। সে তখন তাড়াতাড়ি চারজন লোক ও পাল্কী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সেই সাঁকো থেকে ঐ সুন্দরীকে পাল্কীতে বসিয়ে ঐ রাজমহলে ফিরে এল। সেখানে চিৎকার কর বলল, "আমার বড় ভাইদের সঙ্গে আমারও বিয়ে হোক।"

মেয়েটি সুন্দরী বটে, কিন্তু তার পরণে ছিল মোটা পোষাক। তার পোষাক দেখে রাজমহলের সবাই হেসে উঠল।

আচার অনুযায়ী বিয়ের পরের দিন কনেরা বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে। তিন বউ-এরই বাবা-মা ছিল, ছিল না ছোট বউ-এর। তার বাবা-মা না থাকার জন্য তাকে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হল। তাকে নিয়ে তিন বউ হাসি ঠাট্টা করল।

মাস কয়েক পরে নববর্ষ এল। নববর্ষের উপহার দেওয়া নেওয়া সম্পর্কে বড় তিন ভাইয়ের বউদের মধ্যে আলোচনা হল। ঐ তিন দম্পতির মধ্যেই খুশীর আমেজ। ছোট বউ-এর প্রশ্নের জবাবে বলল, "আমি খুব গরিব। আমার চিন্তা হবে না? আমি ভাল উপহার আনব কোত্থেকে।"

"কেন আনতে পারব না? এক কাজ কর, সমুদ্রতীরে যাও। জলে যে বাক্স ভাসতে থাকবে সেটা নিয়ে এস।" ছোট বউ বলল।

ছোট ভাই সমুদ্রতীরে এসে সত্যি সত্যি একটা বাক্স ভেসে যেতে দেখল। বাক্সটা খুব পুরোন।

বাক্স এনে ছোট ভাই বউ-এর হাতে দিল। ছোট বউ বাক্সের ঢাকনা খুলে তাকে উঁকি মেরে দেখতে বলল। ছোট ভাই উঁকি মেরে দেখে অবাক হয়ে গেল। সেখানে দেখতে পেল এক নতুন জগৎ। এক বিরাট নগর। বড় বড় রাজপথ, মহল, নাট্যশালা, বিচিত্র বস্তুতে সজ্জিত অসংখ্য দোকান, নানা ধরণের জীবজন্তু। এসব দেখে তাজ্জব বনে গেল ছোট ভাই। স্বামী-স্ত্রীতে ঐ বাক্সে ঢুকে ঘুরে

ঘুরে দেখল ঐ নগর। সব দেখে শুনে ছোট ভাই তো বিস্ময়ে অভিভুত।

ছোট ভাই আর থাকতে না পেরে তিন ভাই আর বৌদিদের ঐ নগর দেখতে আমন্ত্রণ জানাল। সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে নগর দেখতে লাগল। ওরা টের পেল না কি ভাবে ওরা একদিন একরাত কাটিয়ে দিল ঐ নগরে। সে এক নতুন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

এই ধরণের একটি বাক্স ছোট ভাইয়ের কাছে থাকাতে বড় তিন ভাইয়ের ঈর্ষা হল। তিন ভাই যা দেখল তা রাজাকে জানাল। রাজা নিজের ছোট ছেলের কাছে এ ধরণের যে একটি বাক্স আছে তা জানত না। বড়, মেজ আর সেজ ছেলের কাছে ঐ নতুন নগরের বর্ণনা শুনে রাজার মনে ঐ নগর দেখার ভীষণ কৌতূহল জাগল। এদিকে ঐ তিন ভাইয়েরও আর একবার ঐ নগর দেখার প্রবল ইচ্ছে জাগল। রাজা ছেলেদের আর একবার যেতে বারণ করল। রাজা ভাবল এহেন এক বিচিত্র বাক্স একমাত্র তার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে থাকা উচিত নয়।

ঐ বাক্সের কথা শুনে সেনাপতি ভাবল, এই ধরণের একটা বাক্স থাকলে যুদ্ধের সময় খুব কাজ দেবে। হয়তো ঐ আজব নগরের রাজার কাছে অসংখ্য সৈন্য আছে।

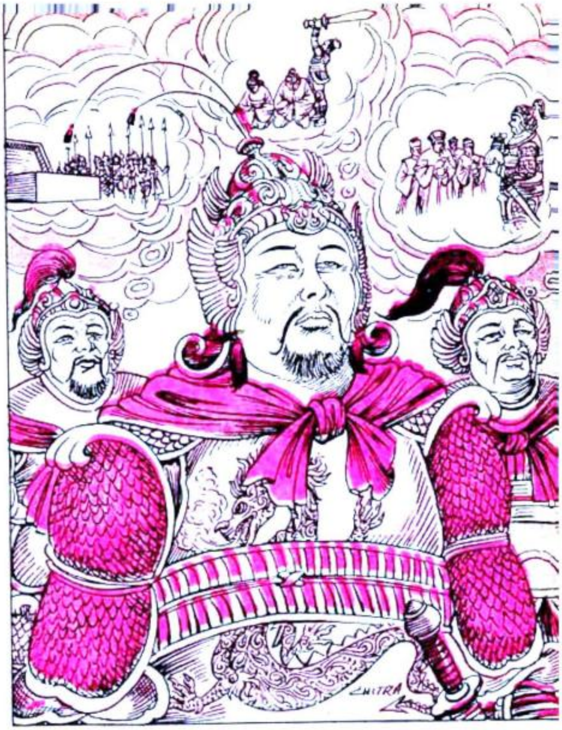


ঐ বাক্সের কথা শুনে মন্ত্রী ভাবল, এই ধরণের এক আজব নগরে নিশ্চয়ই ধনীর সংখ্যা বেশী। রাজার তরফ থেকে ওদের উপর যদি আমি বেশী বেশী কর বসাই তাহলে নিজের পক্ষেও খুব ভাল হবে।

রাজা, সেনাপতি ও মন্ত্রী কোন কথা না বলে ভাবতে লাগল। ওদের মগজে একের পর এক পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। কেউ ভাবল ছোট ভাইকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে দূর করে দেওয়ার কথা। কেউ ভাবল এই ধরণের এক বিচিত্র বাক্স রাখার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত।

অনেক পরিকল্পনার পরে ঠিক হল রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতি ঐ নগর দেখতে যাবে। তারা সেই নগরে যাওয়ার জন্য রওনা হল। তারা ছোট ভাইকেও সস্ত্রীক সঙ্গে নিল।

সেই নগরে গিয়ে রাজা সোজা রাজ-মহলে ঢুকল। সে নগরে মহল ছিল কিন্তু রাজা ছিল না। তবে সেবক ও সৈনিক ছিল বহু। রাজা মহলে বসে মদ আনতে নির্দেশ দিল। তারপর রাজা আপন মনে মদ খেতে লাগল। মন্ত্রী আর সেনাপতি না পারছে বসতে না পারছে সেখান থেকে সরে যেতে।

রাজা মদ খেতে খেতে ভাবল, এই বেইমান সেনাপতি আর বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা করছে, কিভাবে এই বিচিত্র বাক্স হাতানো যায়। ওদের সে গুড়ে বালি। রাজা ঠিক করল ওদের মেরে ফেলবে।

পর মুহূর্তেই রাজার নির্দেশে সেনাপতি ও মন্ত্রীর গর্দান গেল।

এখন বাকি রইল ছোট আর তার বউ। রাজা নেশার ঘোরে ঐ দুজনকে কী করবে ভাবছিল আর ওদের দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে ঐ মহলে জল ঢুকল। দেখতে দেখতে এক হাঁটু জল জমে গেল। কিন্তু রাজার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ছোট আর তার বউ চোখের পলকে মহল ছেড়ে চলে গেল। ওরা কোন রকমে বাক্স থেকে বেরিয়ে এল।

ছোটর বউ স্বামীকে বলল, এই বাক্স জলে ভরে গেছে এবার এটাকে ছেড়ে দাও।

তারপর ঐ রাজাকে আর কেউ কোন-দিন দেখেনি। হয়ত ঐ বিচিত্র নগরের বন্যার জলে ডুবে ঐ রাজা হারিয়ে গেছে অথবা মারা গেছে।

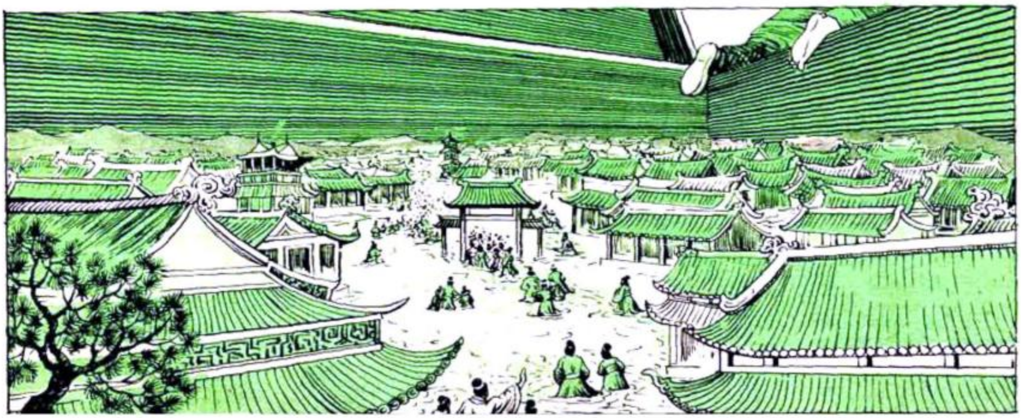

# কেনা বেচা

এক গ্রামে ছিল দুই বন্ধু। এক বন্ধুর কাছে ছিল ভাল জাতের একটা ঘোড়া। একদিন ঘোড়ার মালিক তার বন্ধুকে বলল, "আমার ঘোড়ার দাম কত হবে?"

"একশো টাকা দিতে পারি।" অন্য বন্ধু বলল। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াকে বিক্রি করে ঘোড়ার মালিক ভাবল, ঘোড়ার দাম আরও বেশি হওয়া উচিত। তাই সে দেড়শো টাকায় ঐ ঘোড়াটাকে বন্ধুর কাছ থেকে কিনে নিল। অন্য বন্ধু পরে আবার দুশো টাকায় ঘোড়াটাকে কিনে নিল।

এই ভাবে দুই বন্ধুর মধ্যে ঘোড়ার কেনা বেচা অনেকদিন ধরে চলছিল। ফলে ঘোড়ার দাম বারশো পর্যন্ত উঠল। হঠাৎ একদিন এই কেনাবেচার মাঝে তৃতীয় জন নাক গলিয়ে তেরশো টাকায় ঐ ঘোড়াটাকে কিনে নিয়ে গেল।

এখন তাদের কাজ নেই যে করে আর খৈ নেই যে ভাজে।

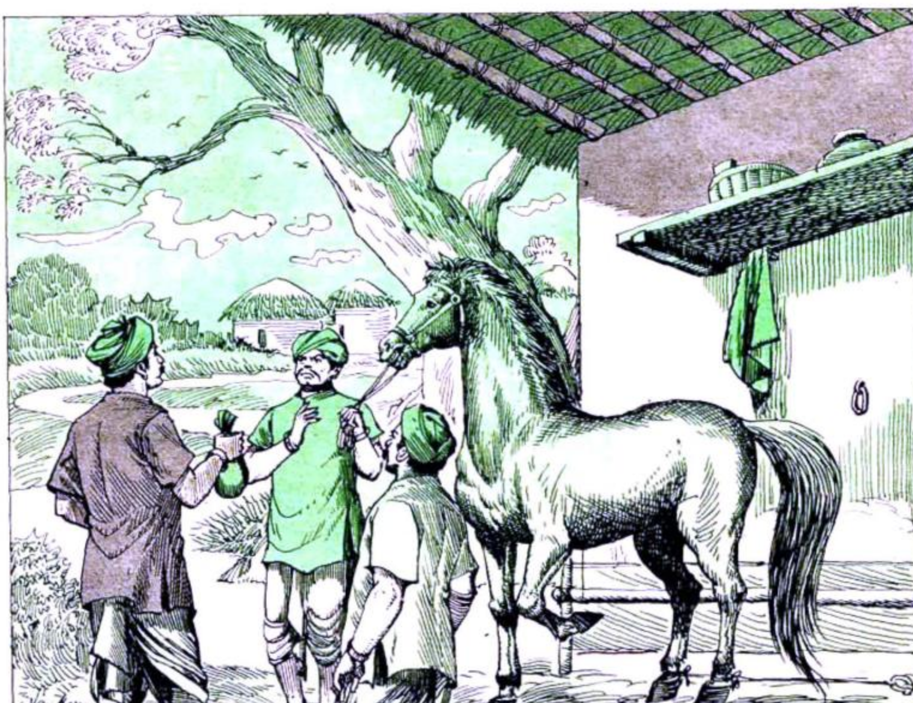

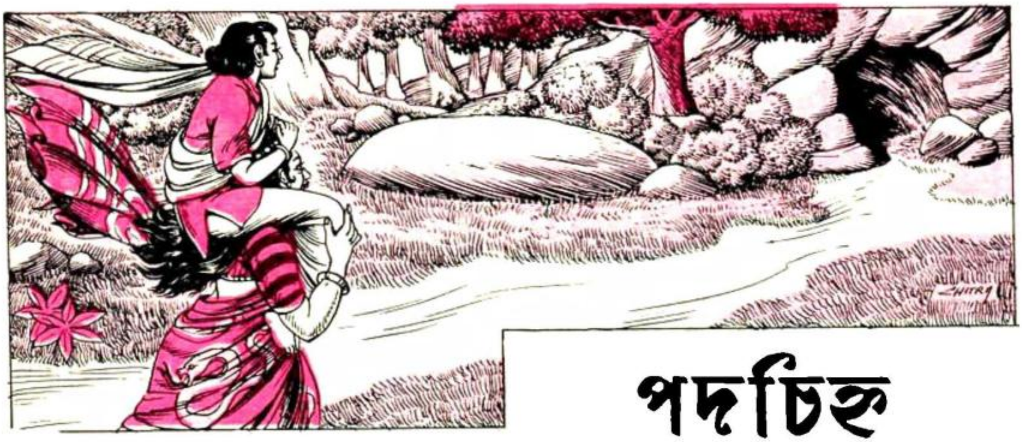

# পদচিহ্ন

প্রাচীনকালে তিন বছর সেবা করে যক্ষিণী এক বনপ্রদেশের অধিকারিণী হতে পারে। সেই বনাঞ্চলের একটি গুহায় থেকে লোকজন দেখতে পেলেই তাদের ধরে খেয়ে নিত। লোকের যাতা-য়াতের প্রধান পথ ঐ বনের ভিতর দিয়ে যাওয়ায় ঐ যক্ষিণীর কোন দিন খাবার অভাব হত না।

একবার এক ব্রাহ্মণ ঐ পথে যাচ্ছিল। তাদের দেখেই যক্ষিণী হুঙ্কার ছাড়ল। ব্রাহ্মণের সঙ্গে যারা ছিল তারা সবাই যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। ব্রাহ্মণ কিন্তু যক্ষিণীর কবলে পড়ে গেল। যক্ষিণী তাকে নিয়ে নিজের গুহায় ঢুকল।

ব্রাহ্মণের ছোয়া পেয়ে যক্ষিণীর মনে তার প্রতি আকর্ষণ জাগল। তাই সে ঐ ব্রাহ্মণকে খেয়ে না ফেলে স্বামী হিসেবে রেখে দিল। যক্ষিণী প্রত্যেক দিন মানুষ ধরে এনে খেত। আর তাদের কাপড়, খাদ্যবস্তু প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে এনে দিত। গুহা থেকে বেরুনোর সময় যক্ষিণী একটা বড় পাথর গুহার মুখে বসিয়ে রাখত। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ছিল না ঐ পাথর সরানোর।

কিছুকাল পরে যক্ষিণীর একটি ছেলে হল। যক্ষিণী স্বামী ও সন্তানকে খুব যত্ন করত। কয়েক বছর পরে ছেলে বড় হল। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও যক্ষিণী গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে চলে গেল। যক্ষিণী চলে গেলে ছেলেটি পাথর সরিয়ে বাপকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গুহা থেকে। যক্ষিণী ফিরে এসে ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, "কে এই পাথর সরিয়েছে?"

"মা, আমি এই পাথর সরিয়েছি। গুহায় যে ভীষণ অন্ধকার!" ছেলেটি বলল। যক্ষিণী তাকে কিছু বলেনি।

একদিন ছেলেটি বাপকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, আপনাকে দেখতে এক রকম আর মাকে দেখতে আর এক রকম কেন?"

"বাবা, তোমার মা হল এক যক্ষিণী। মানুষ ধরে খেয়ে বেঁচে আছে। তুমি আর আমি হলাম মানুষ।" বাবা বলল।

"তাহলে আর আমরা এখানে পড়ে থাকব কেন? যেখানে মানুষ আছে সেখানে গেলেই তো পারি।" ছেলে বলল।

"আমরা এখান থেকে পালাতে গেলে তোমার মা আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।" বাবা বলল।

ছেলে সাহসে বুক বেঁধে বাবাকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ওরা দুজন যক্ষিণীর সামনে পড়ে গেল। যক্ষিণী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি পালাচ্ছ কেন? এখানে কিসের অভাব?"

"আমাকে দোষ দিয়ো না। তোমার ছেলেই আমাকে নিয়ে পালাচ্ছে।" ব্রাহ্মণ বলল। ছেলের প্রতি দারুণ দুর্বলতা থাকায় যক্ষিণী তাকে আর কিছু না বলে ওদের দুজনকে গুহায় ফিরিয়ে আনে।

ছেলে ভাবল, মার ঘুরে বেড়ানোর সীমা আগে জানতে হবে। তার সীমার বাইরে কোন রকমে চলে যেতে পারলে আর তাদের ধরতে পারবে না। ছেলে মাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সমস্ত সম্পত্তির আমিই তো একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমার অধীনে কতখানি জায়গা জমি আছে তা আমাকে দেখাবে না? আমি তো কিছুই জানি না মা।"

যক্ষিণী চার দিকের বন জঙ্গল পাহাড় দেখিয়ে বলল, "দেখ বাবা আমার অধীনের বন হচ্ছে তিন যোজন চওড়া আর পাঁচ যোজন লম্বা।"

দু-তিন দিন পরে যক্ষিণীর গুহা থেকে বেরুনোর পরেই বাবাকে কাঁধে নিয়ে ছেলে তীব্র বেগে পালাতে লাগল। মা

তাকে যে সীমারেখা বলেছিল সে তা পেরিয়ে একটা নদীর তীরে পেঁছাল।

ততক্ষণে যক্ষিণী টের পেয়ে সীমান্তে এসে কাতরভাবে চিৎকার করে বলল, "বাবা, তুই তোর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আয় । আয় ওভাবে পালাস না।"

ছেলে বলল, "মা, আমি আর বাবা হলাম মানুষ। তুমি হলে যক্ষিণী। আমরা আর কতকাল তোমার কাছে থাকব বল।"

"তুইও ফিরবি না বাবা ? ওরে শোন, তোকে চিন্তামণি বিদ্যা দিচ্ছি। এই বিদ্যার ফলে তুই বার বছর আগেকার পদচিহ্ন চিনতে পারবি।" পুত্র নদীর অন্য প্রান্ত থেকেই মন্ত্র শিখে নিয়ে মাকে প্রণাম করল।

"ওরে! তুই ফিরে না এলে আমি বাঁচতে পারব না। তুই ফিরে আয় বাবা।" ঐ ভাবে কাঁদতে কাঁদতে যক্ষিণী বলল।

অবশেষে যক্ষিণী সেখানেই মারা গেল।

ছেলে মায়ের মৃত্যুতে দুঃখ পেল। ফুল দিয়ে মাকে পূজো করল। চিতায় শুইয়ে তার মাকে পুড়িয়ে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বারানসী চলে গেল। সেখানে গিয়ে রাজার কাছে খবর পাঠাল। রাজা জানতে পারল যে তার রাজ্যে একজন পদচিহ্ন চিহ্নিতকারী এসেছেন। রাজা তাকে দরবারে ডেকে পাঠাল। রাজা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন্ কোন্ বিদ্যা জান ?"

ব্রাহ্মণপুত্র বলল, "মহারাজ, আমি বার বছর আগেকার পদচিহ্ন চিনে হারানো জিনিসের সন্ধান করতে পারি।"

রাজা তাকে এক হাজার মুদ্রা বেতনে রাজদরবারে রেখে দিলেন।

এক দিন রাজপুরোহিত রাজাকে বলল, "মহারাজ, এই পদচিহ্ন চিহ্নিতকারী এক হাজার মুদ্রা বেতনে রাখা হয়েছে অথচ কোন কাজ করানো হয় না।"

রাজা ঠিক করলেন পদচিহ্ন চিহ্নিত-কারীর পরীক্ষা নেবেন। কয়েকজন কর্ম-চারীকে ডেকে তাদের হাতে একটি মোহর দিলেন। আর গোপনে কি যেন বলে দিলেন। রাজপুরোহিতও ওদের সঙ্গে ছিল।

ওরা ঐ মোহর নিয়ে রাজমহল থেকে নাবল। রাজমহল তিনবার পরিক্রমা করল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে অলিন্দে উঠল। অলিন্দ থেকে বাইরে নাবল। সেখানে একটি মণ্ডপে ওরা বসল। মণ্ডপ থেকে আবার অলিন্দে উঠল। পরে সেখান থেকে নেবে একটি পুকুরের চারদিকে তিনবার ঘুরল। পুকুরে নেবে ঐ মোহরটাকে ওরা লুকিয়ে রেখে ফিরে এল রাজার কাছে।

পরে রাজা প্রচার করলেন যে একটি দামী মোহর হারিয়ে গেছে। রাজা পদচিহ্ন চিহ্নিতকারীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "রাজমহলের একটি মোহর চুরি গেছে। মোহরটির সন্ধান করে বল।"

"মহারাজ, বার বছর আগে যা হারিয়ে গেছে তা যখন চিনে আনতে পারি, সবে হারানো জিনিস আনতে পারব না কেন?" পদচিহ্ন চিহ্নিতকারী বলল।

পদচিহ্ন ধরে কাজ শুরু করার আগে ব্রাহ্মণপুত্র নিজের মাকে স্মরণ করল। মন্ত্র উচ্চারণ করল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, "মহারাজ, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে দেখছি চোর দুজন আছে।"

এক পা এক পা করে পদচিহ্ন চিহ্নিত-কারী এগোতে লাগল। রাজমহল থেকে নিচে নাবল। রাজমহল তিনবার পরিক্রমা করল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে অলিন্দে উঠল। অলিন্দ থেকে বাইরে নাবল। সেখানে

একটি মণ্ডপে থামল। মণ্ডপ থেকে আবার অলিন্দে উঠল। সেখান থেকে পরক্ষণেই নেবে ঐ পুকুরের কাছে গেল। পুকুরের চারদিকে তিনবার ঘুরল। তারপর পুকুরে নাবল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মোহর নিয়ে পদচিহ্ন চিহ্নিতকারী রাজমহলে গিয়ে রাজার হাতে ঐ মোহর দিয়ে বলল, "মহা-রাজ, চোর কিন্তু বয়স্ক লোক মনে হচ্ছে।"

তখন রাজা ভাবল, এই লোকটা চুরি যাওয়া জিনিস চিনে আনতে পারলেও চোরের সন্ধান বোধহয় করতে পারে না। তাই রাজা তাকে বলল, "জিনিস পাওয়া গেছে বটে কিন্তু চোরের তো কোন হদিশ হল না। লোকে ভাবতে পারে মোহরটা তুমিই চুরি করে লুকিয়ে রেখেছ।"

"চোর ধারে কাছেই আছে মহারাজ। তা আমি বলছিলাম, মোহর যখন পাওয়া গেছে, চোর নাইবা ধরতে গেলেন।" পদচিহ্ন চিহ্নিতকারী বলল।

"কোন ঘটনার মাধ্যমে দূর না করলে তা তাদের মনে থেকেই যাবে।" রাজা বলল।

"ঠিক আছে মহারাজ, কাল দরবারে সকলের সামনেই জানাব কে চোর।" পদচিহ্ন চিহ্নিতকারী বলল।

পরের দিন রাজা দরবারে সকলের সামনে পদচিহ্ন চিহ্নিতকারীকে বলল, "কোই বল কে চোর।"

"কি বলব মহারাজ, মোহর চোর হিসেবে তো আমি আপনাকে ও আপনার পুরোহিতকেই দেখতে পাচ্ছি।" পদচিহ্ন চিহ্নিতকারী বলল।

তার কথা শুনে রাজদরবারের সবাই অবাক হয়ে একবার রাজার দিকে আর একবার তার দিকে তাকাতে লাগল।

রাজা খুশী হয়ে পদচিহ্ন চিহ্নিতকারীকে বহু মূল্যবান উপহার দিয়ে মোহরটা কিভাবে লুকোনো হয়েছে জানালেন। ঘোষণা কর-লেন যে তার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

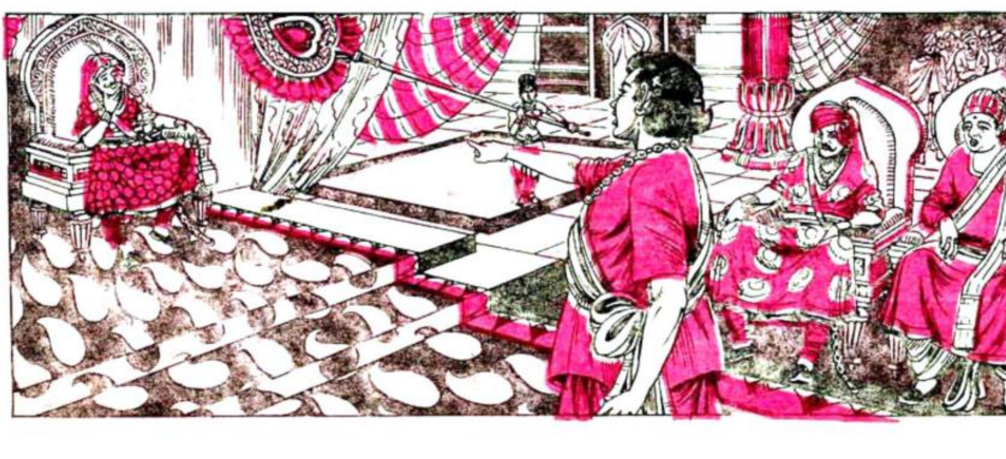

# মহাভারত

ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ হয়েছিল কৃপ আর শল্যর সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর অভিমন্যুর। দুর্যোধনের পুত্র লক্ষণ ও অভিমন্যুর সঙ্গেও যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে লক্ষণকে পরাজিত হতে দেখে দুর্যোধনসহ বহু কৌরবযোদ্ধা অভিমন্যুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। অভিমন্যু নির্ভয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। কিছুক্ষণ পরে অর্জুন পৌঁছে গেলেন সেইখানে। দেখতে দেখতে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ কৌরবপক্ষের রথী মহারথীরাও সেখানে পৌঁছে গেলেন। সেই মুহূর্তে অর্জুনকে মোকাবিলা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। অর্জুন যেন প্রলয়কালের রুদ্ররূপ ধারণ করেছিল।

দেখতে দেখতে কৌরব পক্ষের বহু সেনা নিহত হল। অনেকে পালিয়ে গেল। তখন ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, "আজ আর অর্জুনের বিরুদ্ধে কেউ পারবে না। সূর্য অস্ত গেছে। আজকের মত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করা হোক।"

পরদিন সকালে কুরুপিতামহ ভীষ্ম গরুড় ব্যূহ তেরী করলেন। পাণ্ডবরাও অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করলেন।

আরম্ভ হল দুই দলের প্রচণ্ড যুদ্ধ। দ্রোণের দ্বারা রক্ষিত কৌরবব্যূহ আর ভীমার্জুন দ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবব্যূহ কোন ব্যূহই বিচ্ছিন্ন হল না। সৈন্যেরা ব্যূহের সামনে থেকেই বেরিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

ঘোড়া, হাতী ও অসংখ্য সৈন্যের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র ঢেকে যেতে লাগল। রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগল রণভূমিতে।

কুরুপক্ষের ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরু–মিত্র, বিকর্ণ ও শকুনি আর পাণ্ডবদলের ভীমসেন, ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ বিপক্ষের সৈন্যদের বিতাড়িত করতে লাগলেন। কুরুসৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হতে লাগল। ভীমের শরের আঘাতে দুর্যোধন অচেতন হয়ে রথের উপর পড়ে গেলেন। তখন তাঁর সারথি তাঁকে রণভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কুরুসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল।

সজ্ঞালাভ করার পর দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন, "পিতামহ, আপনি অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দ্রোণ এবং মহাধনুর্ধর কৃপ জীবিত থাকতে আমাদের সৈন্যরা সব পালিয়ে যাচ্ছে। পাণ্ডবগণ কখনই আপনার সমতুল্য যোদ্ধা নয়। তারা নিশ্চয়ই আপনার অতি স্নেহের পাত্র। তাই উপেক্ষা কর–ছেন।" আপনার উচিত ছিল পাণ্ডব, সাত্যকির সঙ্গে আপনি যে যুদ্ধ করবেন না তা আগেই আমাকে জানানো। ধৃষ্টদ্যুম্নের বিরুদ্ধেও যে আপনি অস্ত্রধারণ করবেন না, তা আমি ভাবতেও পারিনি। আপনার, দ্রোণের ও কৃপের মনোভাব যদি আমি আগে জানতে পারতাম তাহলে আমি অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। কর্ণের সাথেই আমি সব কাজ ঠিক করে নিতাম। এখন আর অবহেলা না করে প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করুণ।"

ভীষ্ম রাগে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছিল।

ভীষ্ম রক্তবর্ণ চোখে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "রাজা, তোমাকে আমি পূর্বে বহুবার বলেছি যে পাণ্ডবদের জয় করা অত সহজ নয়। আমি বৃদ্ধ, তবুও যথাশক্তি যুদ্ধ করব আজ একাই আমি পাণ্ডবগণকে এবং তাদের বন্ধু ও সৈন্যদের প্রতিহত করব।"

ভীষ্মের মুখে এই প্রতিজ্ঞাবাণী শুনে দুর্যোধন এবং তাঁর ভাইরা আনন্দিত মনে শঙ্খ ও ভেরী বাজালেন।

সেই দিন পূর্বাহ্ণ অতীত হয়ে যাওয়ার পর ভীষ্ম বিরাট এক সৈন্যদল নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তারপর দুর্যোধনাদি দ্বারা রক্ষিত হয়ে পাণ্ডব সৈন্যের দিকে অগ্রসর হলেন।

ভীষ্মের শরের আঘাতে পীড়িত হয়ে পাণ্ডবগণের মহাসেনা কাঁপতে লাগল। আর মহারথীগণ পালাতে লাগলেন। অর্জুন প্রভৃতি অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের রোধ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসৈন্যগণ ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়ল। সকলেই হতবাক হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

ঠিক তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "পার্থ, তোমার আকাঙ্খিত সময় উপস্থিত। মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে ভীষ্মকে আঘাত কর।"

অর্জুন কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন ভীষ্মের কাছে রথ নিয়ে যেতে। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি রথ নিয়ে ভীষ্মের কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর ভীষ্ম আর অর্জুনের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হতে লাগল। অর্জুনের অস্ত্রচালনার দক্ষতায় ভীষ্ম আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, "সাধু পার্থ, সাধু পাণ্ডুপুত্র।"

ভীষ্ম অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, "বৎস, আমি তোমাকে দেখে অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

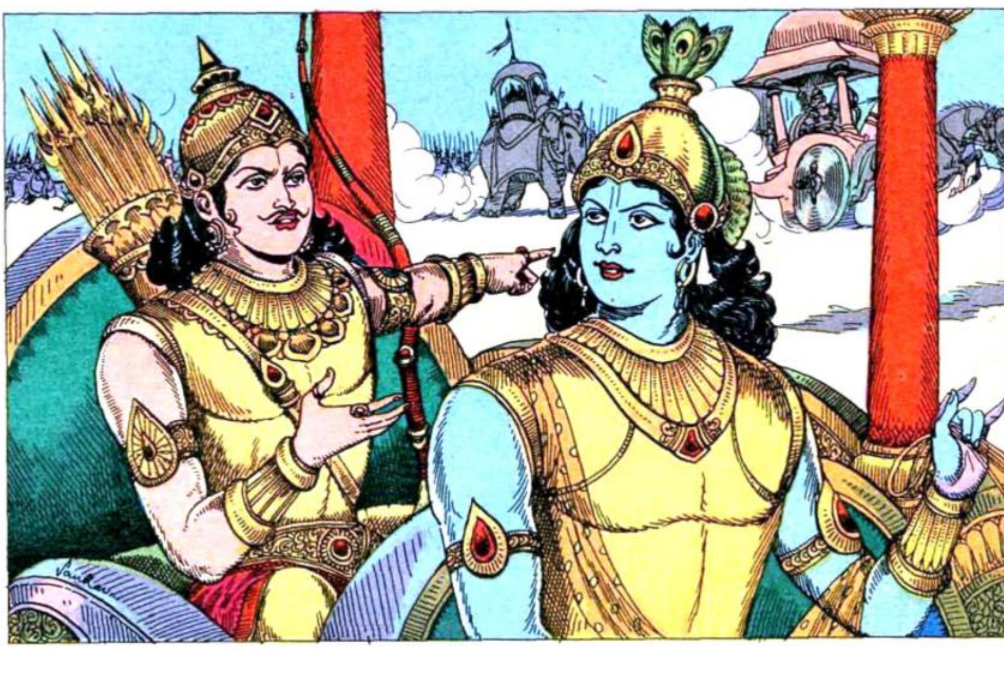

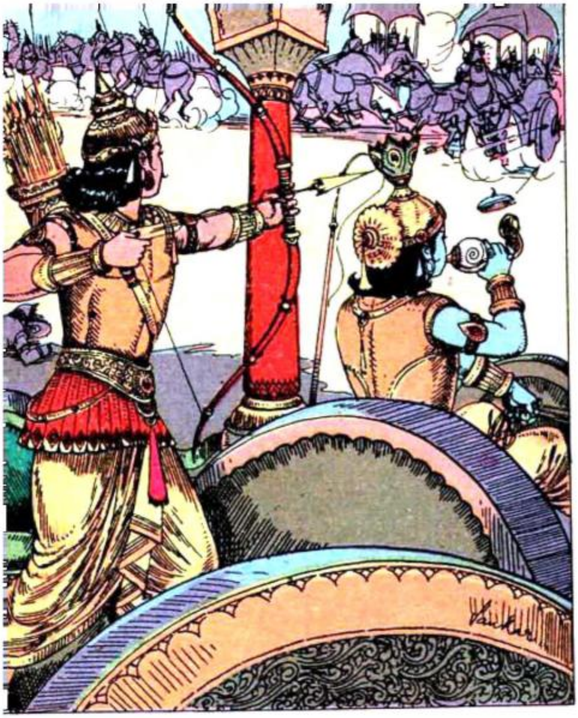

কর্তব্য হারিয়ে ফেলছেন। চিন্তা করে কেশব সঙ্কল্প করলেন, আজ আমিই ভীষ্মকে বধ করে পাণ্ডবদের ভার হরণ করব।

এদিকে সাত্যকি বললেন, কৌরবগণের শত সহস্র অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিক সকলেই অর্জুনকে বেষ্টন করছে। ভীষ্মের শরের আঘাতে পীড়িত হয়ে বহু পাণ্ডব সৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে।

এই রকম অবস্থা দেখে সাত্যকি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ক্ষত্রিয়গণ, কোথায় যাচ্ছ? পালিয়ে যাওয়া সজ্জনের ধর্ম নয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না। বীর ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন কর।"

এই সময়ে কৃষ্ণ অশ্বচালনায় এক আশ্চর্য কৌশল দেখালেন। তিনি ভীষ্মের সমস্ত বান ব্যর্থ করে দ্রুতবেগে মণ্ডলাকারে রথ চালাতে লাগলেন।

কিন্তু ভীষ্মের পরাক্রম এবং অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ চালনা দেখে ভগবান কৃষ্ণ চিন্তিত হলেন। তিনি ভাবলেন, যুধিষ্ঠির শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর এই সুযোগে উল্লসিত হয়ে কৌরব সৈন্যেরা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। অর্জুন তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে আহত হয়েও নিজের কর্তব্য করছেন না। ভীষ্মের গৌরব তাঁকে আভিভূত করে রেখেছে। তাই নিজের

কৃষ্ণ সাত্যকিকে বললেন, যারা যাচ্ছে তারা যাক, তাদের যেতে দাও, আর যারা আছে তাদেরও যেতে দাও। দেখ, আজ আমিই অনুচরসহ ভীষ্ম-দ্রোণকে নিপাতিত করব। এই পার্থ সারথির কাছে একটি কৌরব সৈন্যও নিস্তার পাবে না। ভীষ্ম-দ্রোণাদি এবং ধৃতরাষ্ট্রগণকে বধ করে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে বসাব।"

এই কথা বলে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র স্মরণ করলেন। স্মরণ করা মাত্র সুদর্শন চক্র তাঁর হাতে বিরাজ করতে লাগল। তিনি রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। তার পর সেই ক্ষুরধার সূর্যদীপ্ত সহস্রবজ্রতুল্য চক্র ঘোরালেন। সিংহ যেমন মদমত্ত

হাতীকে বধ করতে যায় সেইরূপ ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের শরীরে পীতবর্ণের দীর্ঘ উত্তরীয়। তিনি বিদ্যুৎ বেষ্টিত মেঘের মত ক্রোধে সগর্জনে চক্র হাতে আসছেন দেখে কৌরবগণ ভীত হলেন। কৌরবগণের বিনাশের ভয়ে সকলে আর্তনাদ করে উঠল।

ভীষ্ম ধীর স্থির কণ্ঠে কৃষ্ণকে বললেন, "দেবেশ, জগন্নিবাস চক্রপাণি মাধব, এস এস, তাড়াতাড়ি, তোমাকে নমস্কার করি। সর্বশরণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাতিত কর। হে কৃষ্ণ, তোমার হাতে আমি নিহত হলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবো। ইহলোকে ও পরলোকে আমি শ্রেয়োলাভ করব। আমার প্রতি তুমি ধাবিত হয়েছ এতেই আমি সকলের কাছে সম্মানিত হয়েছি।"

তখন কৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন, "এই যে অসংখ্য যোদ্ধারা মারা যাচ্ছে এর জন্য প্রধানত তুমিই দায়ী। মিথ্যার আশ্রয়ে যখন পাশা খেলতে বসেছিল, তখন তো তুমি দুর্যোধনকে বাধা দিলে না। আর আজ তুমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছো। ও যদি তোমার কথা মত না চলে তুমি তাকে ত্যাগ করছ না কেন?"

"ঐ তো আমার রাজা। রাজাকে যে দেবতার মত মানতে হয়।" ভীষ্ম বললেন।

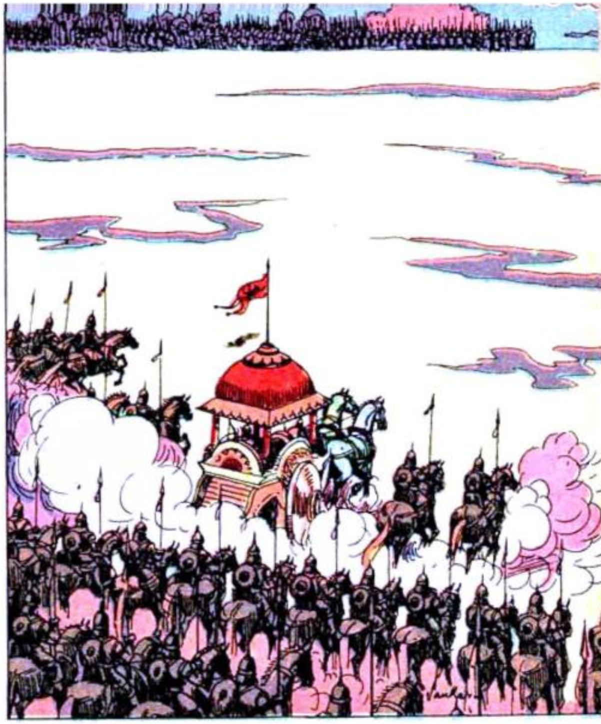

"যারা সত্যের বিরোধী তাদের বিনাশ নিশ্চিত।" কৃষ্ণ বললেন।

এই রকম অবস্থায় অর্জুন আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারলেন না। লাফিয়ে রথ থেকে নেমে পড়লেন। কৃষ্ণের দুই হাত চেপে ধরলেন এবং বায়ুর মতই কৃষ্ণের দ্বারা কিছুদূর ধাবিত হলেন। শেষে কৃষ্ণের দুটো পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন, "কেশব, তুমিই পাণ্ডবগণের গতি, তুমি ছাড়া বড় অসহায় হয়ে পড়বে তাঁরা। এ বিপদ থেকে তুমিই তাঁদের রক্ষা করতে পার। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি তোমার রাগ সংযত কর। আমি

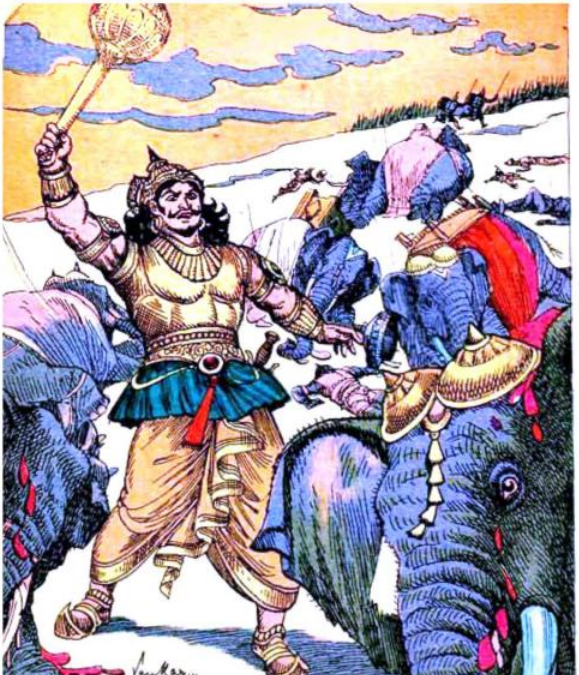

আমার পুত্র ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করছি, আমার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করবো না। তোমার ইচ্ছানুযায়ী যুদ্ধ করব এবং কৌরবগণকে বধ করব।”

অর্জুনের কথায় কৃষ্ণ প্রীত হয়ে আবার রথে আরোহণ করলেন। তারপর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে চারদিক ও আকাশ নিনাদিত করলেন।

এর পর অর্জুন অতি ভয়ঙ্কর মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কৌরব পক্ষের বহু পদাতিক, অশ্ব, রথ ও হাতী বিনষ্ট হল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রক্তের নদী বইতে লাগল। সূর্যাস্ত হলে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন।

কৌরব সৈন্যেরা আলোচনা করতে লাগল, আজ অর্জুন একাই দশ হাজার রথী, সাত শ হস্তী এবং সমস্ত প্রাচ্য সৌবীর ক্ষুদ্রক ও মালব সৈন্য নিপাতিত করেছেন। তিনি একাকীই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য প্রভৃতি বীরগণকে জয় করেছেন। সৈন্যেরা আতঙ্কিত হল। তারা সহস্র মশাল জ্বেলে ত্রস্ত হয়ে শিবিরে চলে গেল।

পরদিন সকালে আবার ভীষ্ম সৈন্যদল নিয়ে মহাবেগে অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন। আবার প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগল।

এদিকে অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল্যপুত্র ও চিত্রসেনের সঙ্গে অভিমন্যুর প্রবল যুদ্ধ হতে লাগল। ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে শল্যপুত্রের মাথা চূর্ণ করলেন। এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি শল্যের রথ রক্ষা করতে লাগলেন।

অন্যদিক থেকে ভীমসেন এগিয়ে এল শল্যকে সাহায্য করতে। দুর্যোধন ভীমকে আসতে দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দশ হাজার গজসৈন্য পাঠালেন। কিন্তু ভীম সেই হস্তীর দল পদাঘাতে বিনষ্ট করে রণস্থলে শিবের ন্যায় নাচতে লাগলেন।

সেনাপতি, জলসন্ধ, সুষেণ, বীরবাহু, ভীম, ভীমরথ, সুলোচন প্রভৃতি দুর্যোধনের আরও চোদ্দজন ভ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ

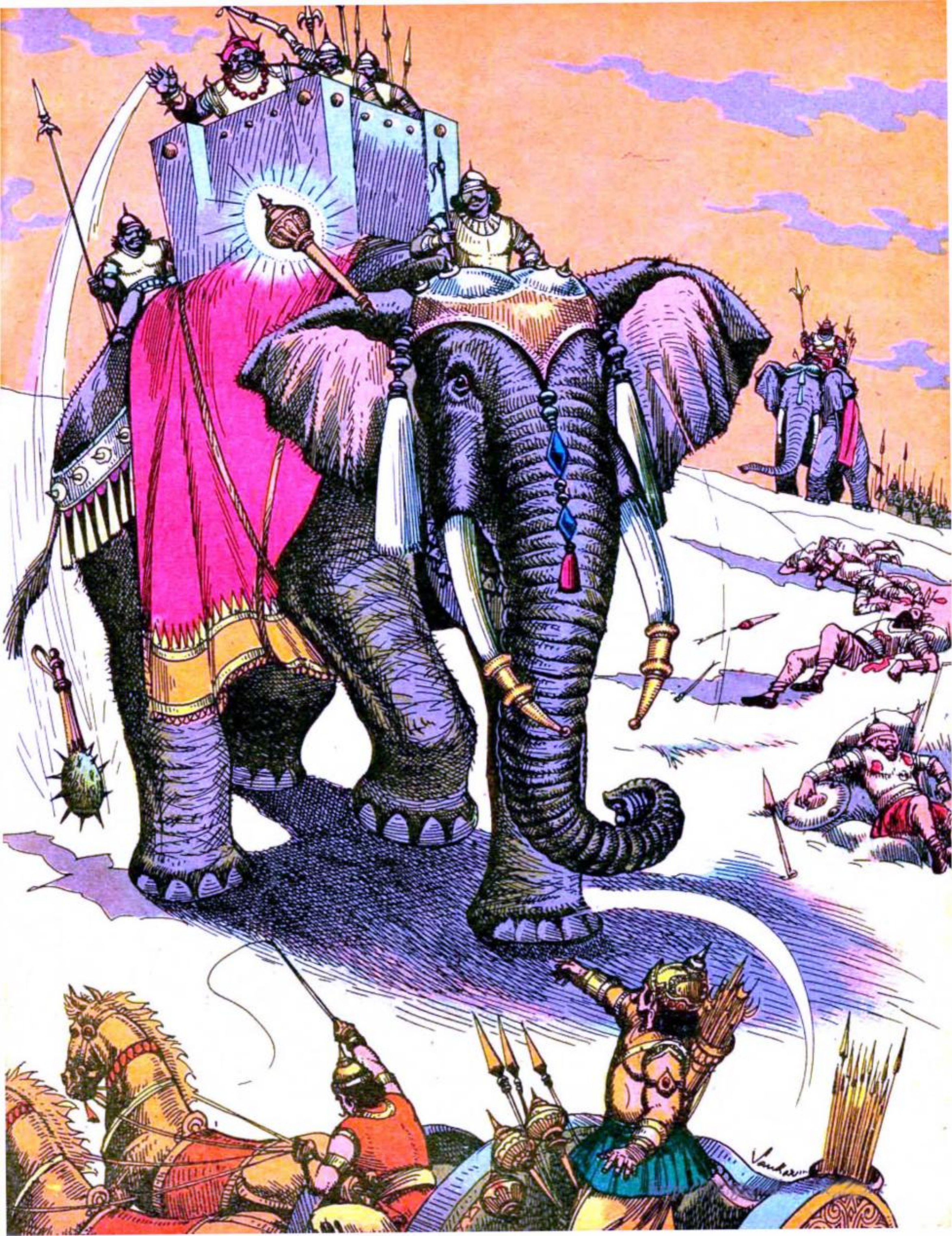

করলেন। বাঘের মত ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে ভীমসেন সেনাপতির মস্তক ছেদন করলেন। জলসন্ধের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন। সুষেণ, বীরবাহু, ভীম, ভীমরথ ও সুলোচনকে যমালয়ে পাঠালেন। দুর্যোধনের অন্যান্য ভ্রাতারা সবাই ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

এসব দেখে ভীষ্ম ভগদত্তকে আদেশ দিলেন ভীমকে আক্রমণ করতে। ভীষ্মের আদেশে ভগদত্ত এক বিরাটকায় হাতীতে চড়ে ভীমসেনকে দমন করতে এলেন।

ভগদত্তের শরাঘাতে ভীম মূর্ছিত হয়ে রথের ধ্বজদণ্ড ধরে রইলেন। পিতার এই অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ অদৃশ্য হয়ে মায়া-বলে ঘোর মূর্তি ধারণ করলেন। তারপর হাতীর উপরে চড়ে দেখা দিলেন। তাঁর অনুচর রাক্ষসগণ অঞ্জন বামন ও মহাপদ্ম নামক দিদ্গজে চড়ে উপস্থিত হল।

এইভাবে চতুর্দন্ত দিদ্গজ চতুর্দিক থেকে ভগদত্তের হাতীকে আক্রমণ করল।

ভগদত্তের হাতী ভয়ে আর্তনাদ করে পালাতে লাগল। ভগদত্ত প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু হাতী ভয়ে এদিক ওদিকে ছুটে পালাতে চাইছে।

ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন সকলে ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য দ্রুতবেগে সেখানে হাজির হলেন। যুধিষ্ঠিরাদিও পিছনে চললেন।

ঠিক সেই সময়ে ঘটোৎকচ অশনি গর্জনের মত সিংহনাদ করলেন।

ভীষ্ম বললেন, "দুরাত্মা হিড়িম্বাপুত্রের সঙ্গে এখন আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। এখন ও বলবীর্য ও সহায় সম্পন্ন। এখন ও প্রচণ্ড শক্তি বহন করছে। কিন্তু আমাদের সব বাহন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমরাও ক্ষত বিক্ষত হয়েছি। সূর্যদেবও অস্তে যাচ্ছেন। কাজেই আজকের মত যুদ্ধের বিরাম হোক। ভীষ্মের ঘোষণা অনুযায়ী সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রইল। শ্রান্ত দেহে যে যার শিবিরে আশ্রয় নিল।

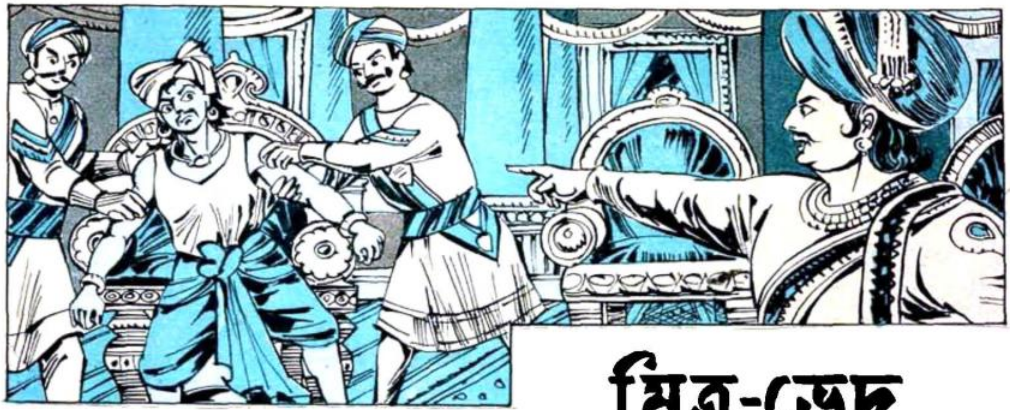

# মিত্র-ভেদ

## চার

সঞ্জীবককে দমনক কাহিনীটি শোনাল ঃ

বর্দ্ধমান নগরে দণ্ডিল নামে এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিল। সে নগরপালের পদে থেকে সমস্ত কাজ কারবার দেখা-শোনা করত। লোকশ্রুতি আছে যে রাজা যাকে ভালবাসে প্রজারা তাকে ভালবাসে না, প্রজারা যাকে আপন করে রাজা তাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। একমাত্র দণ্ডিল রাজা ও প্রজা দুপক্ষেরই মনের মত কাজ করতে পারত।

একবার দণ্ডিল নিজের কন্যার বিয়ে দিল। সেই বিয়ে উপলক্ষে দণ্ডিল নগরবাসী ও রাজকর্মচারি উভয় পক্ষকেই নিমন্ত্রণ করল এবং প্রত্যেককেই দামী কাপড় দিল। বিয়ের পর রাজা ও রাণীকে বর-কনেকে আশীর্বাদ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। রাজা ও রাণী তৈরি হল দণ্ডিলের বাড়ি আসার জন্য। তাদের আসার আগেই রাজকর্মচারিরা পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে রাজমহলের ঝাড়ুদার গোরভও ছিল। রাজপুরোহিতের জন্য যে আসন সংরক্ষিত ছিল গোরভ হঠাৎ গিয়ে সেই আসনে বসে পড়ল। দণ্ডিল তাকে সেই আসন ছেড়ে উঠে পড়তে বলল। কিন্তু গোরভ উঠতে চাইল না। শেষে দণ্ডিল তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। তারপর রাজা ও রাণী এসে বর-কনেকে আশীর্বাদ করে গেলেন।

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

এই ঘটনায় গোরভ খুব অপমান বোধ করল। সে এই অপমানের বদলা নেবার পথ খুঁজতে লাগল। সে ভাবল দণ্ডিলের বিরুদ্ধে রাজার মনে যদি ক্রোধ জাগাতে পারি। যে বদলা নিতে পারে না তার মত নির্লজ্জ আর নেই। গরম কড়াইয়ের উপর সরষে যতই ফুটুক ফাটুক তাতে কড়াইয়ের কিছুই যায় আসে না। আমি ঝাড়ুদার। দণ্ডিল কোটিপতি। একাধারে নগরশাসক ও রাজার খাজাঞ্চী। তা সত্ত্বেও আমি দেখিয়ে দেব—যে আমিও ইচ্ছে করলে অপমানের বদলা নিতে পারি।

রাজার জাগার আগেই রাজার শোওয়ার ঘরে ঝাঁট দেবার ব্যবস্থা ছিল।

পরের দিন রাজার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। রাজা জেগে ঘুমাচ্ছিল। গোরভ ঘর ঝাঁট দিতে দিতে আপন মনে বলে যেতে লাগল, "দণ্ডিলের সাহস তো কম নয়। বড় রাণীকে আলিঙ্গন করে। দণ্ডিলের কত বড় বুকের পাটা।"

একথা শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে বসে গোরভকে জিজ্ঞেস করল, "এই তুমি গুন গুন করে আপন মনে যা বলছ তা কি সত্য? দণ্ডিল কি সত্যি বড় রাণীকে আলিঙ্গন করেছে?"

"মহারাজ, আমি কাল অনেক রাত পর্যন্ত পাশা খেলছিলাম। এখন ঘুমের ঘোরে কি বলে ফেলেছি ঠিক মনে করতে পারছি না।" গোরভ জবাবে বলল।

রাজা মনে মনে ভাবল, "রাণীর ঘরে দণ্ডিল আর গোরভ ছাড়া আরতো কোন বাইরের পুরুষ মানুষ ঢোকে না। দণ্ডিলের ঐ অপকর্ম নিশ্চয় গোরভ দেখে ফেলেছে। কাল বিয়ে বাড়িতে দণ্ডিল অন্য রাণীর চেয়ে বড় রাণীকেই অত্যন্ত বেশি আদর আপ্যায়ন করেছিল। ওর এত খাতিরের উদ্দেশ্য কি হতে পারে। ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। লোকে বলে মদ খাওয়ার পর নেশার ঘোরে আর ঘুমের ঘোরে অনেক রহস্য চাপা থাকে না, প্রকাশ হয়ে পড়ে। বহু পত্নী থাকার ফলে আমিও

বড় রাণীর উপর অত নজর রাখতে পারি না।" এই সুযোগ নিয়ে বড়রাণীও হয়ত দণ্ডিলের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে থাকবে। আর দণ্ডিল নিশ্চয় এতবড় সুযোগ হারাবার পাত্র নয়।" এসব কথা ভাবতে ভাবতে বিছানায় শুয়েই ঠিক করে নিল কি করবে। রাগে ফুলতে লাগল। দ্বারপালকে রাজা আদেশ দিল দণ্ডিল যেন রাজমহলে ঢুকতে না পারে।

অন্য দিনের মত সেদিনও সকালে দণ্ডিল রাজমহলে ঢুকতে গেল। কিন্তু তাকে বাধা দিল দ্বারপাল। অবাক হয়ে দণ্ডিল তাদের জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে বাধা দেবার মত এতবড় সাহস তোমরা পেলে কোত্থেকে?"

"মশাই, আপনি আমাদের উপর রাগ করবেন না। আমরা রাজার আদেশ পালন করছি মাত্র।" দ্বারপালগণ বলল।

"অসম্ভব। রাজা কখনই এই ধরণের আদেশ দিতে পারেন না।" দণ্ডিল দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

যে কোন কারণে রাজা হয়ত আপনার উপর রাগ করেছেন। তবে আমরাতো রাজার আদেশ পালন করতে বাধ্য। সেটা আমাদের কর্তব্য।" দ্বারপালগণ বলল।

রাজা তার উপরে কোন কারণে চটে গেছেন, কথাগুলো শুনে দণ্ডিল আর কোন কথা বলতে পারল না। থ বনে গেল। তখন দণ্ডিলের মনে পড়ে গেল বৃদ্ধদের কথা, "ধন সম্পত্তি পেয়ে দেমাগ হয় না, ভোগ লালসায় পড়ে বিপদে পড়ে না, এমন লোক নেই। রাজার কাছে কেউ প্রিয় হতে পারে না। মৃত্যুর হাত থেকে কারো রক্ষা নেই। ভিখারি কখনও সমাদৃত হয় না। কাকের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, জুয়ায় সততা, মাতালের মধ্যে দর্শন, রাজার মধ্যে স্নেহের ভাব কখনো কেউ কি দেখেছে?" আমি স্বপ্নেও রাজার কোন ক্ষতি করিনি। তা সত্ত্বেও রাজা আমার উপর রাগ করেছেন? দণ্ডিল এই সব কথা ভাবতে লাগল।

ঠিক এই সময় গোরভ দ্বারে এসে বলল, "এ যেভাবে আমাকে বাড়ি থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে ফেলেছিল, একে সেই ভাবে বের করে দাও।"

এই কথা শুনে দণ্ডিল ভাবল, তাহলে গোটা ব্যাপারটার পিছনে নিশ্চয় এই গোরভ আছে। সেইদিন রাত্রে দণ্ডিল গোরভকে ডেকে পাঠাল। তাকে ভাল ভাল কাপড় উপহার দিয়ে দণ্ডিল বলল, "দেখ গোরভ, কাল রাজপুরোহিতের আসনে বসে পড়লে তো, উঠতে বললে ওঠনি, তাই কাজের ঝামেলার মধ্যে আমার মাথার ঠিক ছিল না, তাই তোমাকে ওভাবে বের করে দিয়েছি। তুমি কিছু মনে করনা গোরভ।"

গোরভের তৎক্ষণাৎ সব রাগ জল হয়ে গেল। সে বলল, "দেখুন না, রাজাকে এমন করে দেব না, আবার আপনাকে ডাকাডাকি করবেন।"

পরের দিন রাজা শুয়ে শুয়ে গোরভের গলা শুনতে পেল। সে বলছে, "দূর দূর রাজার আক্কেল বলতে কিছুই নেই। তা না হলে কেউ পায়খানায় বসে শশা খায়!"

রাজা তাড়াতাড়ি উঠে বলল, "এই তুমি আমাকে দেখেছ ওখানে শশা খেতে?"

"আজ্ঞে, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। কি বলতে কি বলে ফেলেছি।" গোরভ বলল।

রাজা বুঝল যে গোরভের কথার কোন দাম নেই। ভাবল, দণ্ডিল খুব ভাল লোক। তার অভাবে নগরের কাজকর্ম সব গোলমাল হয়ে গেছে। খাজাঞ্চী হিসেবেও সে কত যোগ্য। তার একদিনের অভাবেই কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

তারপর রাজা দণ্ডিলকে ডেকে পাঠিয়ে ভুল স্বীকার করে পূর্বপদেই বহাল রাখলেন।

# পপৈরস

সর্বপ্রথম মিশরবাসী কাগজ তৈরি করার জন্য পপৈরস নামক জলজ উদ্ভিদের ব্যবহার করেছিল। এ হল ৬০০০ বছর আগেকার ঘটনা। আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি তার জন্ম এক হাজার বছর আগে। কিন্তু তার পেপার নাম পপৈরস থেকেই এসেছে। সিসিলিতে দুশো বছর ধরে পপৈরস গাছের চাষ হয়। তা দিয়ে কাগজ তৈরি হয়। নিম্ন-লিখিত চিত্রে প্রদর্শিত পপৈরস সৈরাক্যুস (সিসিলির) কাছে একটি নদীতে জেগে ওঠে। পপৈরস গাছের জলের নিচের অংশ দিয়েই কাগজ তৈরি করা হয়।

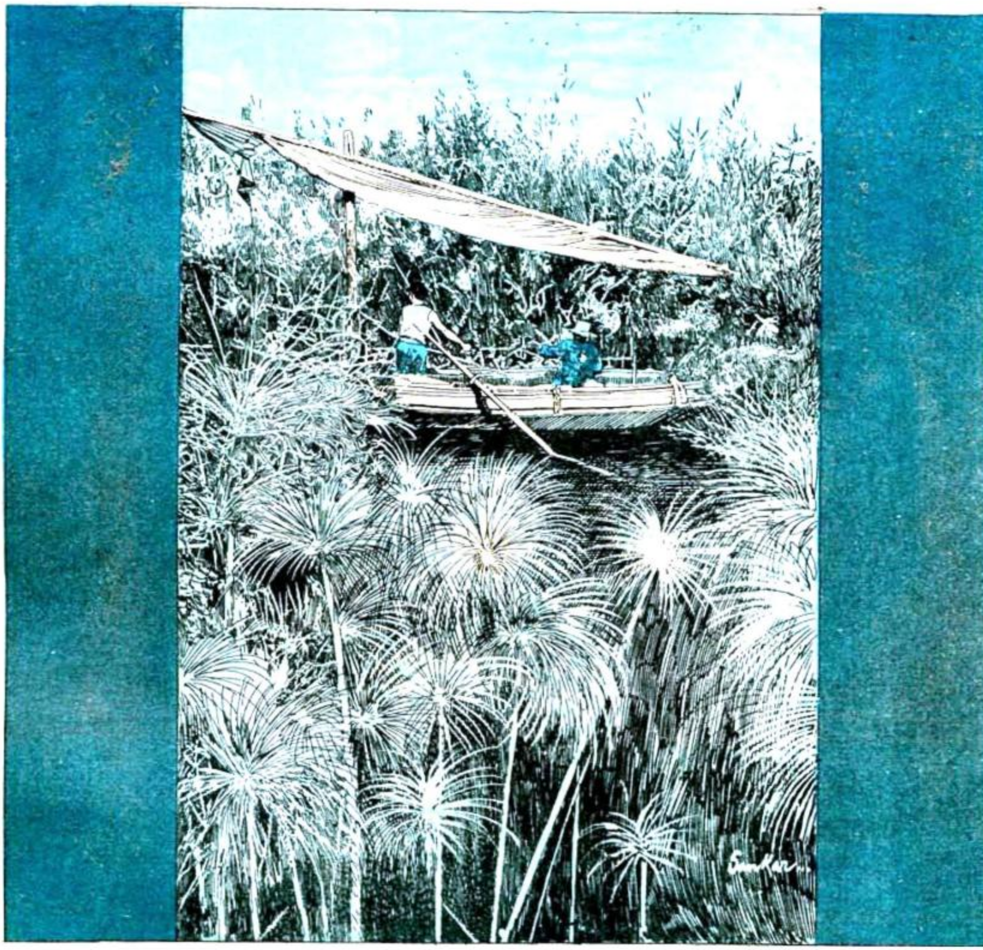

ফটো : দিলীপ ব্যানার্জী

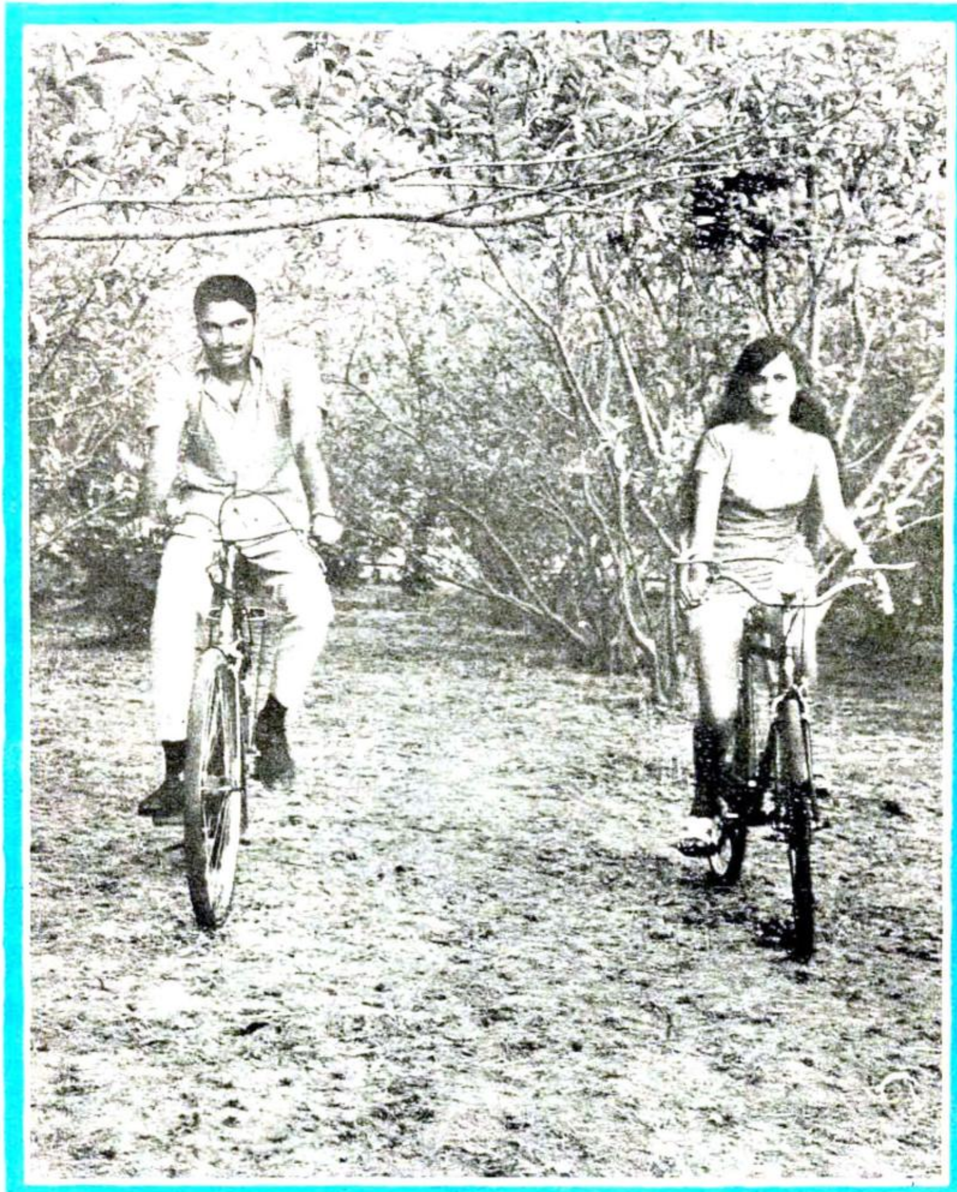

পুরস্কৃত নাম

সাইকেল চেপে সঙ্গে যাওয়া

পুরস্কার পেলেন
পূর্ণেন্দু শেখর বিশ্বাস

ফটো : শম্ভু মুখার্জী

১৩০ কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

টাঙ্গায় বসে হাওয়া খাওয়া

পুরস্কৃত
নাম

# ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে ডিসেম্বর '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো ফেব্রুয়ারী '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

# চাঁদমামা

## এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার


| | | | |
|---|---|---|---|
| অমরবাণী | ... ৮ | কিপটে ও গ্রামবাসী | ... ৩১ |
| যক্ষপর্বত | ... ৯ | দুর্বুদ্ধি | ... ৩৯ |
| হারানো সুযোগ | ... ১৭ | কেনা বেচা | ... ৪৩ |
| কে বড় | ... ২৪ | পদচিহ্ন | ... ৪৪ |
| সন্ন্যাসী | ... ২৫ | মহাভারত | ... ৪৯ |
| সোমশর্মা | ... ২৯ | মিত্রভেদ | ... ৫৭ |


দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

**যে চাকা বছরে একবার ঘোরে**

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

**যে হাতী কোনদিন নড়ে না**


Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: CHAKRAPANI

Photo by: K. S. PALANI

মিত্রভেদ